ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ।। ২ ফাল্গুন, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

রাজ্য সরকারের মুসলিম সংরক্ষণ

কড়া সমালোচনা প্রবীণ তোগাড়িয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। যখন অন্ধ্র হাইকোর্ট মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ও চাকরীতে চার শতাংশ সংরক্ষণ খারিজ করেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুসলমানদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণের তীব্র সমালোচনা করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। দিল্লী থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে ডাঃ তোগাড়িয়া বলেছেন, সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের (ও বি সি) জন্য এই সংরক্ষণ একরকম 'আই ওয়াশ' বা চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। এটা সাংবিধানিক মারপ্যাঁচ এবং পরিশ্রমী হিন্দুদের বঞ্চিত করার সামিল। বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী এবং অন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা কঠোর পরিশ্রম করেন এবং সরকারকে কর জমা দেন। তপসিলি জাতি, জনজাতি এবং ও বি সি হিন্দুদের ওই সুবিধা না দিয়ে ধর্মের অজুহাতে বেশি সংখ্যক সন্তান উৎপাদনে তৎপর মুসলমানদেরকে ভর্তুকি পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা শুধুমাত্র হিন্দুদের প্রতি অসৌজন্য নয়, হিন্দুদেরকে লুট করার মতো অপরাধ। এই প্রসঙ্গে সাচার রিপোর্ট এবং রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশকে ডাঃ তোগাড়িয়া হিন্দুদের ক্রিমিন্যালি লুট করার পূর্বপ্রস্তুতি বলে অভিহিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুসলমানদের জন্য এই দশ শতাংশ সংরক্ষণকে শ্রী তোগাড়িয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায় মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ককে তোষণ করার জন্যই হিন্দুদেরকে বঞ্চিত করে সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই সময়ে দেশের ৭৮ শতাংশ হিন্দু যুবকরা বেকার। ৭৯ শতাংশ হিন্দু কৃষকরা জমি হারিয়েছে। অনেকে আত্মহত্যা করছে। ৬৮ শতাংশ হিন্দু ছেলে-মেয়েরা অপুষ্টির শিকার। তাদের দিকে না তাকিয়ে মুসলমানদেরই সরকার প্রাধান্য দিচ্ছে। ওই বিবৃতিতে ডাঃ তোগাড়িয়া এই সংরক্ষণের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এদিকে গত ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রবীণ বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ মুরলীমনোহর যোশীও ধর্মের ভিত্তিতে

(এরপর ৪ পাতায়)

চীনা পণ্য বয়কট অরুণাচলে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নয়াদিল্লীর 'ভরসা'য় না থেকে তাদের বিরুদ্ধে চীনের যাবতীয় 'ষড়যন্ত্রে'র জবাব দিতে শুরু করল অরুণাচলের মানুষ। 'নেতৃত্বে' রয়েছে সেখানকার প্রভাবশালী ছাত্র-সংগঠন অল্ অরুণাচল প্রদেশ স্টুডেন্ট ইউনিয়ান, সংক্ষেপে এ এ পি এস ইউ।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সেখানে 'চীনা-পণ্য' বয়কট শুরু হয়েছে। এই 'বয়কটে'র মুখ্য কারণ হিসেবে ছাত্র-সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাম্প্রতিক কালে অরুণাচলপ্রদেশ তাদেরই অংশ—এই অজুহাতে অরুণাচলবাসীকে 'চীন-ভ্রমণে'র জন্য ভিসা দিতে যেভাবে 'অস্বীকার' করেছিল চীন এবং তারপরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর ইটানগর 'পরিদর্শনে'র সময়ে ক্রমাগত যে 'চীনা-বাধা' আসছিল, তা ভালভাবে গ্রহণ করেননি 'অরুণাচলের মানুষ'। সেই 'অপমানে'র বদলা পণ্য-বয়কটের

(এরপর ৪ পাতায়)

১০০ দিনের কাজেও মুসলিমদের অগ্রাধিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সরকারিভাবে মুসলমানদের জন্য কোনও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। তা সত্ত্বেও কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকার ঘুরপথে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে মুসলিমদের কাজের ব্যবস্থা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এবার যাবতীয় নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ১০০ দিনের কাজে মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর। এ নিয়ে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও নির্দেশ পাঠায়নি। এর আগে যাবতীয় এ ধরনের সিদ্ধান্তে রাজ্যের অজুহাত ছিল কেন্দ্র সরকারের নির্দেশেই যা করার করা হচ্ছে। কিন্তু ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্র কোনও নির্দেশ পাঠায়নি। তাও রাজ্য সরকার মুসলিমদের এই প্রকল্পে অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা করছে। ১০০ দিনের কাজই এখন রাজ্যে গ্রামোন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। বছরে এই প্রকল্পে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা খরচ হয়। এখানে মুসলিমদের অগ্রাধিকারের অর্থ, সরাসরি মুসলমানদের হাতে ডোলের টাকা তুলে দেওয়া। কীভাবে সরকার ১০০ দিনের কাজে মুসলিমদের অগ্রাধিকার দিতে বলেছে, সেটাও দেখার মতো। মহাকরণ থেকে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে নির্দেশ পাঠিয়ে বলা হয়েছে, ১০০ দিনের কাজে কত জন মুসলিম কাজ পেয়েছে, তার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে জানাতে হবে মুসলিম কাজপ্রাপকদের সংখ্যা। আমলারা বলছেন, এটা আসলে নীচের তলায় চাপ তৈরির চেষ্টা। সরকারকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে এই ভাবেই পঞ্চায়েতগুলি মুসলিমদের আরও কাজ দেবে। মুসলিমরা কাজ পেলে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু মুসলমানদের কাজ দিতে যদি হিন্দুদের বাদ দেওয়া হয় তাহলে আপত্তি আছে বইকি। এনিয়ে নীচের স্তরে প্রতিক্রিয়া

হতেও বাধ্য। যেমন সরকারি হিসাব বলছে, এখনও পর্যন্ত ৮৬.৯৬ লক্ষ শ্রম দিবসের মধ্যে ৩৭ শতাংশ তপশিলি জাতি, ১৪ শতাংশ তফশিলি উপজাতি এবং ৩১ শতাংশ মহিলা কাজ পেয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুসলিমরা কাজ পেলে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং মহিলারাই বঞ্চিত হবে। ১০০ দিনের কাজগুলিও এদের জন্যই তৈরি হয়েছিল। তোষণের রাজনীতি এবার মূল উপভোক্তাদেরই বঞ্চিত করতে চলেছে।

মন্ত্রী আর মন্ত্রকের অসঙ্গতি চরমে

বি টি বেগুন চাইছে না পরিবেশ মন্ত্রকই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পরিবেশ সংক্রান্ত একের পর এক খামখেয়ালিপনার স্বীকার হচ্ছে ভারত। সৌজন্যে—ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক ও সেই দফতরের মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। বি টি বেগুন নিয়ে 'নাকের জলে-চোখের জলে' এক হবার পর যাঁর দফতরের নতুন কীর্তি—সংরক্ষিত জীব-বৈচিত্র্যের তালিকা থেকে ১৯০টি প্রজাতির নাম বেমালুম ছেঁটে ফেলা এবং দুর্ভাগ্যবশত (পড়ুন সৌভাগ্য) তার মধ্যে বি টি বীজের নামোল্লেখও রয়েছে। যদিও এনিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রমেশ বলেছেন, ''আপনারা যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয় তবে আমি প্রকাশ্যে মার্জনা চাইব। কিন্তু তা যদি না হয় তবে আপনাদের সাংবাদিকতা থেকে অব্যাহতি নেওয়া উচিত।'' তবে এই অভিযোগ যে নেহাতই অমূলক নয় তার প্রমাণও মিলেছে রমেশের কথায়। তাঁর মন্তব্য—''সত্যিই যদি ওই গেজেটে বি টি বীজ সংক্রান্ত কিছু থেকে থাকে, তবে আমি তা প্রত্যাহার করব।'' কিন্তু জয়রাম রমেশ জেনে রাখতে পারেন উপরিউক্ত ঘোষণা সম্বলিত গেজেটটি তাঁরই মন্ত্রক কর্তৃক গত বছরের ২৬শে অক্টোবর প্রকাশিত হয়।

যাইহোক, এই 'ছেঁটে ফেলার' পক্ষে পরিবেশ দপ্তরের যুক্তি হলো, জাতীয় জীব-বৈচিত্র্য আইন অনুসারে, ভারতের প্রজাতিগুলোকে রক্ষার দায়িত্বই কেবলমাত্র তাদের কাঁধে বর্তায়, কিন্তু

ডজন ডজন প্রজাতির ফল, শাক-সব্জী, মশলা-পাতি, ভেষজ উদ্ভিদ, দানা-শস্য, ও ফুল গাছ রক্ষার কোনও দায় তাঁদের নেই। এই যুক্তিটাকে কিছুটা পরিষ্কার করে জাতীয় জীব-বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পি এল গৌতম বললেন,—'নোটিফিকেশনে দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত উদ্ভিদ বাণিজ্যিক-ভাবে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কেবলমাত্র তাদের ওপরই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।'

প্রশ্ন উঠেছে, ওই ১৯০টি প্রজাতি-ই 'বিপন্ন'। সুতরাং কোন্ অধিকারে পরিবেশমন্ত্রক এহেন কর্মটি করতে পারলেন? আর যদি নেহাতই কোনও কারণে করে থাকেন তবে সেটা খোলসা করছেন না কেন তাঁরা? মন্ত্রী আর মন্ত্রকের এহেন পরস্পরবিরোধী মন্তব্যই বা কিসের স্বার্থে? জয়রাম রমেশ পুরো ব্যাপারকেই 'ফালতু' বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। জাতীয় জীব-বৈচিত্র্য আইন—২০০২, অনুসারে বিদেশি ব্যক্তি বা কোম্পানীগুলির দ্বারা যদি ভারতীয় জীববৈচিত্র্যের উৎস দেশ ও দশের উপকারে লাগে তবে বর্তমান আইন মোতাবেক ওই ব্যক্তি বা কোম্পানী সেই ভারতীয় জৈবিক উৎসকে জাতীয় জীব-বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের আওতায় নিয়ে আসবে। আইনটি পরিষ্কার, তারপরেও পরিবেশ মন্ত্রকের এই আচরণ বিস্ময়কর। সবচেয়ে বড় কথা ১৯০টি প্রজাতির মধ্যে সর্পগন্ধা (বিজ্ঞানসম্মত নাম-র‍্যাডোল সার্পেন্টিনা) এবং টাইগার লিলি (বিজ্ঞানসম্মত নাম-গ্লোরিওসা সুপেরবা)—এই দুটি সংরক্ষিত প্রজাতি কোনও ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয় না। তাই পরিবেশবিদদের সন্দেহ বাণিজ্যিক প্রয়োজনটা হয়তো অজুহাত মাত্র। বি টি বেগুনের আপত্তিকর ব্যাপারটা অনেক আমলার কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাই নিজের মন্ত্রকেই চাপের মুখে পড়ে বি টি বেগুন নিয়ে বাণিজ্যিক চাষের অনুমোদন শেষপর্যন্ত স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন জয়রাম রমেশ। সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেছেন খোদ মন্ত্রীই স্বয়ং।

এই সংখ্যায়

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু গণহত্যার বিচার চাই.....৩
বিপর্যয় থেকে বাঁচার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সিপিএম.....৫
লাভ জেহাদ : হিন্দুস্থানকে ইসলামীস্তানে পরিণত করার ষড়যন্ত্র ৮-৯
বইমেলা কি তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে.....১৫

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

অপারেশন গ্রীন হান্ট ঃ শুরুতেই সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন

॥ গূঢ়পুরুষ ॥ মাওবাদী হিংসা ও সন্ত্রাস দমনে পশ্চিমবঙ্গসহ প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও ছত্তিশগড় যৌথভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সাহায্য করার যে সর্বসম্মত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা সত্যিই কতটা কার্যকর হবে সেটাই দেখার। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে কেন্দ্র ও রাজ্য-পুলিশের যৌথ অভিযান এখনও সাফল্য পায়নি। উল্টে পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। মাওবাদীদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে যৌথ বাহিনী বিভ্রান্ত হয়েছে। স্থানীয় শান্তিপ্রিয় হতদরিদ্র আদিবাসীরা পুলিশ এবং সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারের শিকার হয়েছে। অভিযোগ, সি পি এম পার্টি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সামনে রেখে জঙ্গলমহলে গ্রাম দখলের রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালাচ্ছে। অভিযোগ যে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তার প্রমাণ পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম-লালগড় এলাকায় সিপিএম ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদেরও নয়। তাই সেখানের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের হাতে সি পি এম কর্মীরাই খুন হচ্ছেন তার কারণ সেখানে দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঢাল করে সি পি এম গ্রাম দখল করার অভিযানে নেমেছে। তাই মাও-মার্কসবাদীদের খুনোখুনি চলছে সেখানে।

এই বাস্তব পটভূমিকায় মাওবাদী দমনের পরিকল্পনা, 'অপারেশন গ্রীন হান্ট' কতটা সফল হবে সেটাই প্রশ্ন চিহ্ন আকারে দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবং ঝাড়খণ্ডের শিবু সোরেন বুদ্ধ দেববাবুদের সঙ্গে তাঁদের মত পার্থক্যের কথা বলেছেন। তাঁরা সশস্ত্র অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে বনাঞ্চলে জরুরীভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প চালু করার দাবী করেছেন। অন্যদিকে, বুদ্ধ দেববাবুরা চাইছেন মাওবাদী সন্ত্রাসের রাজনৈতিক সমাধান। অর্থাৎ প্রথমে পার্টিরাজ প্রতিষ্ঠা, পরে উন্নয়ন। এই বোঝাপড়ার অভাবই ভবিষ্যতে প্রধান বাধা হয়ে উঠতে পারে। এই অভিযানে সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর ৭০,০০০ অফিসার ও জওয়ান যুক্ত আছে। স্বাধীনতার পর ভারতের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস দমনে এত বড় সশস্ত্র অভিযান অতীতে চালানো হয়নি। ঘোষণা করা হয়েছে ৩১ মার্চের মধ্যেই এই পাঁচ রাজ্যের রেড করিডরকে সন্ত্রাসমুক্ত করে গ্রীন করিডরে পরিণত করা হবে।

প্রশ্ন চিহ্নটা ঠিক এখানেই। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ সশস্ত্র অভিযান শুরু হয় গত জুন মাসে। আট মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সাফল্যের খতিয়ানে ফল শূন্য। তর্কের খাতিরে স্বীকার করছি জঙ্গলমহলে যৌথ অভিযান এবং অপারেশন গ্রীন হান্ট এক নয়। প্রথমটি পুলিশ-কম্যাণ্ডো যুক্ত অভিযান।

দ্বিতীয়টি পুরোপুরি সামরিক অভিযান। এই সামরিক অভিযান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হাতে থাকছে। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব প্রয়োজনে রসদ সরবরাহ এবং তথ্য আদান-প্রদান সাহায্য করা। অতীতে এমন সামরিক অভিযান দেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের রাজ্যে হয়েছে। সাফল্য পেতে বহু বছর লেগেছে। মাওবাদী দমনে অপারেশন গ্রীন হান্ট শুরু হয়েছেনভেম্বরে। মাত্র পাঁচ মাসেই অভিযানে সাফল্য করায়ত্ত হবে এমন ঘোষণা কীভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম করতে পারেন বোঝা সত্যিই দুষ্কর।

এই সময়

যুক্তি বটে!

মূল্য-বৃদ্ধির কারণ কি জানেন? কারণ আপনার ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। এহেন 'অসাধারণ' যুক্তিটি সাজিয়েছেন কেন্দ্রিয় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার। 'শরদীয় অর্থনীতি' এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকল্পে সহজতর সমাধানটিও বার করে ফেলেছে। চিনি কম খান। তাহলেই নাকি কমবে চিনির দাম। যুক্তি বটে! এরাই দেশের নেতা?

অদ্ভুত দাওয়াই

ব্যর্থতার নিরীখে প্রথম স্থানে থাকা ইউ পি এ সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকতে এমন সব দাওয়াই দিচ্ছে যাতে জনগণের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হয়েছে! সম্প্রতি বাড়ি বাড়ি দেরিতে রান্নার গ্যাস পৌঁছনোর প্রতিবিধান হিসেবে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক বলেছে—গ্রাহকরা গ্যাসের দামের সঙ্গে বাড়তি ২৫ টাকা দিলে গ্যাস কোম্পানীগুলো ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করুক। এদিকে গৃহস্থের জন্য বরাদ্দ লাল সিলিণ্ডার যে হোটেলগুলোর হেঁশেলে ঢুকছে—সে ব্যাপারে কিন্তু সরকার নিশ্চুপ।

হে মহাজীবন

জীবন-মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে দেশ-রক্ষার লড়াই-এ তাঁরা চির-অঙ্গীকারবদ্ধ, সেই শপথ তাঁদের পৌঁছে দিয়েছিল সন্ত্রাস কবলিত কাশ্মীরে। কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্য শত্রু তাঁদের প্রাণ নিতে পারল না। তাঁরা প্রাণ দিলেন সম্পূর্ণ এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের গুলমার্গে আচমকাই ধস নামে পাহাড়ে। সেই ধসে এক সেনা-আধিকারিক সহ ১৭ জন সৈনিকের মৃত্যু হয়।

নকশাল মোকাবিলায়

নকশাল মোকাবিলার যাবতীয় ব্লু-প্রিন্ট ছকে ফেলেছে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার। সেই চিত্রনাট্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের নকশাল অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে হেলিপ্যাড বসানো হবে। মোটামুটি 'স্ট্রাটেজিক লোকেশন'-অনুযায়ী চিহ্নিত এলাকাগুলোতে হেলিপ্যাড বসিয়ে নজরদারির কথা ভাবছে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রিয় বাহিনী। প্রশ্ন উঠছে, এই নজরদারির আওতায় বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা অনিবার্যভাবেই চলে আসবেন না তো? তেমন হলে কিন্তু জোটে জট অনিবার্য।

মনমোহিনী বিবেক

দিল্লী হাইকোর্ট সম্প্রতি নিম্ন-আদালত ও নগর-দায়রা আদালতকে বলেছে, ১৯৮৪ সালে শিখ-বিরোধী দাঙ্গার যাবতীয় মামলার নিষ্পত্তি আগামী ছ'মাসের মধ্যে করতেই হবে। সেইমতো, দিল্লী সরকার ও সিবিআই বিশেষ আইনজীবী (প্রসিকিউটার) নিয়োগ করেছে। সজ্জন কুমার আর জগদীশ টাইটেলার এবিষয়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন আগেই। এনিয়ে জুতো হজম করতে হয়েছিল পি চিদাম্বরমকে। নিজের বিবেকের সামনে এবার দাঁড়াতে পারবেন তো প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং?

জিন্দাল-বুদ্ধ সমাচার

সজ্জন জিন্দাল মুখোমুখি হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। শালবনীতে ৩ মিলিয়ন টনের ইস্পাত প্রকল্প থেকে শুরু করে বহু বিষয়ে আলোচনা হলো তাঁদের। বুদ্ধ বললেন—প্রস্তাবিত ওই ইস্পাত প্রকল্পের মাত্রা ৩ থেকে বাড়িয়ে ১০ মিলিয়ন টন করলে হয় না! জিন্দাল আপাতত কিছু বলেননি। একা সিঙ্গুর যখন 'টাটাকে রক্ষা' করতে পারেনি, তিনে শালবনী যে ২০১১-তে বুদ্ধকে 'বাঁচাতে' পারবে না তা বলাই বাহুল্য।

অষ্ট্রেলিয় চালাকি

অষ্ট্রেলিয়ায় নাকি বিদেশী (পড়ুন ভারতীয়) 'হেয়ার-ড্রেসার' ও 'রাঁধুনী'র সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে। যে কারণে সেদেশের অভিবাসন দপ্তর হাজারবিশেক পরিযায়ী বিদেশী ছাত্রের নাম প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছেন। অভিবাসন মন্ত্রী ক্রিস ইজান্স এই 'যুক্তি'টি খাড়া করে বলছেন—আপাতত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং তথ্য-প্রযুক্তি ছাত্রদেরই শুধুমাত্র সেদেশে থাকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। যা শুনে এক দুর্মুখের বক্তব্য—ভারতীয় ছাত্রদের ওপর অজি-আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েই এই কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে অষ্ট্রেলিয় সরকার।

সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব

সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব এবার অনুভূত হবে স্কুল পাঠ্যসূচীতেও। ২০১০-১১ সালের মরসুমে অর্থাৎ এইবার থেকেই দিল্লীর সি বি এস ই বোর্ডের একাদশ শ্রেণীতে 'মিডিয়া ও মাস কমিউনিকেশন, বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। এর বর্ধিত অংশটি সামনের বার অর্থাৎ ২০১১-১২ সাল থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠক্রমেও পড়ানো হবে বলে জানা গেছে। আগে কেবলমাত্র হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ানো হোত বিষয়টি। তারপর এল কলেজে। এখন স্কুলে। এরপরে বোধহয় নার্সারীতেও পঠিত হবে এটি! তবে নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

বিপাকে ফনেস্কা

যেমন শখ হয়েছিল! শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার। এবার বোঝ ঠেলা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হারের জ্বালা মিটতে না মিটতেই রাজাপক্ষকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন শরৎ ফনেস্কা। একদা তাঁর যে সাধের সেনাবাহিনীর সাহায্যে রাজাপক্ষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে প্রভাকরণকে খতম করেছিলেন ফনেস্কা, সেই মিলিটারিই তাঁকে গত ৮ই আগষ্ট কলম্বো থেকে গ্রেপ্তার করে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারত আবার আলোচনার ফাঁদে?

ভারত পুনরায় আগ বাড়াইয়া গাল বাড়াইয়া দিয়াছে পাকিস্তানের দিকে। ভারতের তরফেই বিদেশ সচিবই প্রথম পাক আমলা সলমন বশিরকে আলোচনার প্রস্তাব দেয়। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের মুখে এখন বিজয়ের হাসি। তাহার পিছনে কারণ অনেক। প্রথম কারণ মুম্বাই সন্ত্রাসবাদী হামলাকারীদের ভারতের হাতে তুলিয়া দেওয়া তো দূরের কথা, তাহাদের বিরুদ্ধে সামান্যতম ব্যবস্থাও পাকিস্তান গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভারত নিজ উদ্যোগে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দিয়াছে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করিয়াছে ভারতই; তৃতীয়ত, কাশ্মীর হইতে ৩০,০০০ সৈন্য প্রত্যাহার করিয়াছে ভারতই, প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর দিবস পালন করিয়া সাড়ম্বরে কাশ্মীরের জনগণের লড়াইয়ে সংহতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ভারতই আগ বাড়াইয়া শান্তি আলোচনার প্রস্তাব পাঠাইয়াছে।

মানুষ কিন্তু খোলাখুলি বলিতেছে নির্বাচনের আগে কংগ্রেসী নেতাদের গরম গরম বুলি আজ কোথায় মিলাইয়া গেল? ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অবিলম্বে পাকিস্তানের মাটি হইতে উৎখাত করিতে হইবে, তাহা না হইলে ভারত সরকারই বাধ্য হইবে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে; সন্ত্রাসবাদীদের তালিকা পাঠাইয়া হুংকার দিয়াছিল উহাদের অবিলম্বে ভারতের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, তাহা না হইলে ভারত নিজ উদ্যোগে এ কাজ করিতে বাধ্য হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল গরম গরম বুলি আওড়াইয়া কংগ্রেস কাহাদের ভোট পাইয়া নির্বাচনে বাজিমাৎ করিয়াছিল—হিন্দুদের না, মুসলিমদের? নিশ্চিতভাবেই হিন্দুদের। পাকিস্তান কিংবা ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে বিষোৎগার করিয়া নিশ্চিত মুসলিমরা উল্লসিত হইয়া কংগ্রেসকে ভোট দেয় নাই। তাহা হইলে আবার মুসলিম তোষণ কেন?

পাক প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টতই ইঙ্গিত দিয়াছেন যে তাহাদের মার্কিন নীতিই কার্যকরী হইয়াছে। অর্থাৎ মার্কিন চাপেই ভারত আলোচনায় বাধ্য হইয়াছে। এটাই তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আমেরিকা তাহার আফগান-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ পলিসি অনুসারে তাহারই স্বার্থে পাকিস্তানের কাশ্মীর পলিসিকে তোল্লা দিয়া চলিতেছে। ভারত কী তবে ধীরে ধীরে আমেরিকার কাছে তাহার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইতেছে। কংগ্রেসীরা কী ক্রমেই মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিতেছে? এবং ভারত রাষ্ট্রকে এক মানসিক জড়বৎ পদার্থে পরিণত করিয়া ফেলিতেছে? তাহা না হইলে গোয়েন্দা সূত্রে যেখানে খবর মিলিতেছে যে ভারত সীমান্ত হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিবার পরও ঢত্রচ গোপনে ভারতবিরোধী পাক-জিহাদীদের হাতে বিপুল অর্থ প্রদান করিয়াছে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন অছিলায় কাশ্মীরের জনগণকে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত রাখে এবং এই সুযোগে পাক-জঙ্গিরা পালে পালে ভারতে অনুপ্রবেশ করিতে পারে। এই খবর পাওয়া সত্ত্বেও মনমোহনজী আগ বাড়াইয়া আলোচনার প্রস্তাব দিলেন কেন? বিদেশিনী চালিত সরকার বিদেশের হাতে দেশকে তুলিয়া দিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কী আছে! কিন্তু মনমোহনজী তো ভারতীয় না কি দুর্ভাগ্যক্রমে কেবলমাত্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই যা! অনেকে অবশ্য বলিতেছেন অতীতে যেমন কংগ্রেসেরই আর এক নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নোবেল পুরস্কারের লোভে এই কাশ্মীর প্রশ্নকেই রাষ্ট্রসংঘের বিবেচ্য বিষয় করিয়া দেশের ভিতর এক বিষবৃক্ষ পুঁতিয়া গিয়াছেন, মনমোহনজীরও কী তাই ইচ্ছা!

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

লোকের মনে যাহা ছিল না, মহাপুরুষদের মনে তাহা শূন্য হইতে আসিয়া গজাইয়া উঠে না। ইহারাও নিজ নিজ কাল শক্তিকেই আশ্রয় করিয়া জগতে নব নব মত ও সিদ্ধান্ত, সাধন ও আদর্শের প্রচার করেন। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সম্বন্ধে প্রাচীন আর্যাবর্তের লোকের মনে যে সকল ভাব বিন্দু বিন্দু করিয়া ফুটিতেছিল, তাহাই যেন একীভূত ও ঘনীভূত হইয়া বুদ্ধদেবের মধ্যে মূর্তিমান হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতে ইহুদীয়, গ্রীসে ও রোমে খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে ও অব্যবহিত পূর্বে যে সকল ভাব লোকের মনে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই কেন্দ্রভূত ও প্রত্যক্ষ করিয়া যীশুখৃষ্টের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের এই বাংলা দেশে বহু লোকের অন্তরে যে বৈষ্ণবীভাব অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাই ঘনীভূত করিয়া মহাপ্রভুর অবতার হয়। দেশে যাহা প্রস্ফুট, মহাপুরুষদিগের মধ্যে তাহাই প্রস্ফুট, দেশে যাহা মূক মহাপুরুষদিগের মধ্যে তাহাই মুখর, দেশে যাহা নিরাকার ও অমূর্তভাবরূপে বিদ্যমান থাকে, মহাপুরুষদের মধ্যে তাহাই সাকার ও মূর্তিমান হয়।

—বিপিনচন্দ্র পাল

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু গণহত্যার বিচার চাই

অসিত বরণ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আজ পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। এই পরিবর্তনকে অর্থবহ করতে গেলে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-ভাগের বলি হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালী উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক অবহেলা, বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণ এবং সর্বোপরি জ্যোতি বসুর বামফন্ট নামক সর্বহারা তক্‌মাধারী সরকারের মরিচঝাঁপির সর্বহারা ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর উপর, বিনা দোষে ও বিনা প্ররোচনায়, যে বর্বরোচিত আক্রমণ ও গণহত্যা সংগঠিত করা হয়েছিল ১৯৭৮-৭৯ সালে তার মর্মস্পর্শী কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার। কারণ বহুল প্রচারিত উদ্বাস্তু ও গরীব দরদী বাম সরকারের মুখোশ খুলে দিলে তাদের পতন ত্বরান্বিত হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুরা রক্তপাতের মাধ্যমে নিজেরাই লোক বিনিময় করে নিয়েছিল। এছাড়া কেবল পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্য প্রযোজ্য চারটি বিশেষ কেন্দ্রীয় আইন পাশ করে তাদের সার্বিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় মূলত পূর্ব পাঞ্জাব ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে তাদের অনুকূল পরিবেশে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালী উদ্বাস্তুরা উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে লোক বিনিময় করে বা একসঙ্গে আসতে পারেনি। পশ্চিমবাংলায় কিছু উদ্বাস্তুর জায়গা হলেও বেশিরভাগ উদ্বাস্তুদের ভিন রাজ্যে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হয়। ভিন রাজ্যে বাঙালী উদ্বাস্তুরা তাদের গ্রহণযোগ্য পরিবেশ পুনর্বাসন মেনে নিলেও ১৯৫৭ সাল থেকে দন্ডকারণ্য প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হয়েছিল তাদের বেশিরভাগই প্রতিকূল পরিবেশ, চাষ অযোগ্য পাথুরে জমি ও বন-জঙ্গলে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে পশ্চিমবাংলায় বার বার আসার চেষ্টা করে।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বিরোধী রাম রাজনৈতিক নেতারা উদ্বাস্তুদের এই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতি শুরু করে। এর পরিণতিতে উদ্বাস্তুরা দন্ডকারণ্যের পুলিশি নির্যাতন, গণধর্ষণ, না খেতে পাওয়া, আর্থিক অব্যবস্থা এবং সর্বোপরি বাম রাজনীতিবিদদের ক্রমাগত হাতছানিতে দলে দলে দন্ডক ত্যাগ করে ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবাংলায় ঢোকে। সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেস সরকার তাদের পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

১৯৭৭ সালের জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রে জনতা পার্টি ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হয়। দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের জ্যোতিবাবুদের প্রতিশ্রুতিমতো পশ্চিমবাংলায় তথা সুন্দরবনে আসার রাস্তা পরিস্কার হয়। ১৯৭৮ থেকে দলে দলে সুন্দরবনের দিকে রওনা দেয়। দুই মাস হাসনাবাদে অবস্থান করে মার্চ মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা থানার সুন্দরবনে ২০ মাইল দৈর্ঘ্য ও ৮ মাইল প্রস্থের নতুন নির্জন "অসংরক্ষিত বনাঞ্চলের" "মরিচঝাঁপি" নামক দ্বীপে আশ্রয় নেয় ও বসতি গড়ে তোলে। প্রায় ৩০ হাজার উদ্বাস্তু নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। চাপ থাকলেও তারা এবার কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় যেতে অস্বীকার করে। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল।

হঠাৎ ২০ আগষ্ট, ১৯৭৮ তারিখে ৩০টি লঞ্চে প্রচুর পুলিশ আসে মরিচঝাঁপিতে এবং দন্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এতেও যখন উদ্বাস্তুদের মনোবল ভাঙা গেল না তখন ২৬ জানুয়ারী ১৯৭৯ জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার মরিচঝাঁপিতে ১৪৪ ধারা জারি করে খাদ্য ও পানীয় জল বন্ধ করে উদ্বাস্তুদের 'অনাহারে মারার' ষড়যন্ত্র করে।

উদ্বাস্তুদের থেকে সফল হালদার ও দেবব্রত বিশ্বাস লুকিয়ে নদী সাঁতরে পার হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলে হাইকোর্ট ৯ ফেব্রুয়ারী খাদ্য পানীয় চলাচলের বাধা দূর করে ১৪৪ ধারা প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই আদেশ না মেনে কার্যত অবরোধ চালিয়ে যায়।

তৎকালীন স্থানীয় জনতা পার্টির জয়নগর-সাংসদ শক্তি কুমার সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রসন্নভাই মেহতার নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টারি তদন্ত কমিটি মরিচঝাঁপি পৌঁছায় এবং উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাইহরণ বাড়ৈয়ের ২২.০৩.১৯৭৯ তারিখের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি কমিটির কাছে জমা পড়ে। ওই তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন। কিন্তু অদ্যাবধি সে সম্পর্কে কিছু শোনা যায়নি।

১২ মে থেকে ১৬ মে ১৯৭৯ অবধি পুলিশ-ক্যাডার বাহিনী বর্বরোচিত আক্রমণে বা দন্ডকে ফিরে যাওয়া অবধি কত জন উদ্বাস্তু মারা গিয়েছিল বা কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার হিসাব না পাওয়া গেলেও জানা গেছে যে দন্ডকারণ্য থেকে মরিচঝাঁপি পৌঁছানো অবধি মাঝপথে ২৫০০ হাজারের অধিক উদ্বাস্তুদের মৃত্যু হয় বিভিন্ন কারণে (সঠিক তথ্যের জন্য গবেষণা চলছে)।

দন্ডকে না ফিরে অনেকে পশ্চিমবাংলায় থেকে গেছেন—প্রায় ৬ হাজার। তারা ভালো নেই। দন্ডকে যারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাদের অবস্থা কি? উদ্বাস্তুশূন্য মরিচঝাঁপি কি অবস্থায় আছে? রক্তে-রাঙা মরিচঝাঁপি ভুখা-নাঙ্গা চাষী-জেলের দীর্ঘশ্বাস ও স্বপ্ন ভঙ্গের ইতিহাস কি শোনা যায়?

৩১ জানুয়ারির গণহত্যার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সি.পি.আই (তখনও বামফ্রন্ট ঢোকেনি), জনতা পার্টি, কংগ্রেস, এস.ইউ.সি.আই. থেকে শুরু করে বহু সংবাদপত্র, উদ্বাস্তু ও মানবাধিকার গণসংগঠন, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রতিবাদ করে মিটিং করেছেন, লিখেছেন ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন। কিন্তু আজ অবধি উদ্বাস্তু ও গরীব দরদী বামফ্রন্ট সরকার মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু গণহত্যার বিচারের দাবী মানেনি। মরিচঝাঁপির রাষ্ট্রীয় বর্বরতা যাতে জনসমক্ষে বেরিয়ে না আসে তার চেষ্টা এত বৎসর ধরে করে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার ও সি পি এম। সরকার ঘটনার সময়ে কোনও সাংবাদিককে বা অন্য কাউকে মরিচঝাঁপির কাছে যেতে দেয়নি।

"সংবাদপত্র, উদ্বাস্তু ও মানবাধিকার গণসংগঠন, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রতিবাদ করে মিটিং করেছেন, লিখেছেন ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন। কিন্তু আজ অবধি উদ্বাস্তু ও গরীব দরদী বামফ্রন্ট সরকার মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু গণহত্যার বিচারের দাবী মানেনি। মরিচঝাঁপির রাষ্ট্রীয় বর্বরতা যাতে জনসমক্ষে বেরিয়ে না আসে তার চেষ্টা এত বৎসর ধরে করে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার ও সি পি এম।"

তা সত্ত্বেও বহু সাংবাদিক, তথ্যানুসন্ধানী, লেখক, তথ্য চিত্রকার মরিচঝাঁপির অপকীর্তি ফাঁস করে দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রচারিত হয়েছে। ইতিমধ্যে মরিচঝাঁপির গণহত্যার তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে।

মরিচঝাঁপির দিবস পালন হয় প্রতিবছর—তবে অনাড়ম্বরে। কিছু উদ্বাস্তু সংগঠন ৬ সেপ্টেম্বর মরিচঝাঁপি দিবস পালন করে। এবৎসর অবশ্য ৩১ জানুয়ারি মরিচঝাঁপি দিবস হিসাবে পালিত হলো গণমুক্তি পরিষদ ও মরিচঝাঁপি সংগ্রাম সমিতির সম্মিলিত ডাকে ভারত সভা হল-এ।

মরিচঝাঁপির গণহত্যার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে উত্তর খোঁজা দরকার—(১) বাঙালীরা আন্তর্জাতিক মানের মেধা ও শ্রেষ্ঠতার উত্তরাধিকারি হয়েও পশ্চিমবঙ্গ আজ কেন জাতীয় স্তরে পিছিয়ে যাচ্ছে? (২) বাঙালীদের অতীতের কোনও পরাজয়ের গ্লানিসৃষ্ট হীনমন্যতা বা সামাজিক বিভেদ সৃষ্টিকারী কুপ্রথা ও কুসংস্কার অথবা শহুরে মধ্যবিত্ত-সংকীর্ণতা থেকে সৃষ্ট অনৈক্য, নিষ্ক্রিয়তা ও নিস্পৃহতা তাদের গ্রাস করেছে কি? তা না হলে সর্বহারার তক্‌মাধারী বামফ্রন্ট সরকারের "মরিচঝাঁপি থেকে নন্দীগ্রামের" দুষ্কর্মের দৌড় সহ্য করছে কি করে? কেনই বা গোর্খারা, কামতাপুরীরা বা আদিবাসীরা বাঙালীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বার করে নতুন দিগ্‌দর্শন দিতে পারলে পরিবর্তনের হাওয়া সুনামিতে পরিণত হবে।

স্মরণে মননে স্মৃতিচারণে মনোমোহন রায়

সহমর্মী মনোমোহনদা

প্রমোদরঞ্জন রায়।। কলম ধরে আছি। টপ টপ করে জল পড়ে কাগজ ভিজে যাচ্ছে। মুছে নিচ্ছি। আবারও ভিজে যাচ্ছে। ঝাপসা চোখে চিন্তা করা মাত্রই মনোমোহনদার প্রতিচ্ছবি অন্তর-চোখে ভেসে উঠছে। অনেকক্ষণ লিখতে পারলাম না। এই কয়েকদিন আগে হঠাৎ মনোমোহনদার ফোন। বললেন আমি এখন শিলিগুড়িতে। মাধব ভবনে। আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। একবার আসুন মাধব ভবনে। চারতলায় থাকি। অথবা বাড়ীর ঠিকানাটা দিন। আমিই যাব আপনার বাড়ী। ব্যস্তভাবে বললাম, না না, মনোমোহনদা, আমিই যাচ্ছি আপনার ওখানে।

পরের দিন বন্ধুবর সুশীল অধিকারী এবং বীরেন্দ্রপ্রসাদ সিং সহ মাধব ভবনে গেলাম। অনেক প্রাণের কথা হল। ওই সময় পাশে দেবুদাও (দেবব্রত সিংহ) ছিলেন। কথা শেষ হওয়ার পর মনোমোহনদা তখনও বললেন, কতদূর আপনার বাড়ী, চলুন আপনার সঙ্গে যাব, আমাকে আবার দিয়ে যাবেন। সেদিনও তিনজনে আর একজায়গায় যাব বলে মনোমোহনদার ইচ্ছানুসারে বাড়ী নিয়ে যেতে পারলাম না। অন্তিমকালের তাঁর কোনও ইচ্ছাই পূরণ করতে না পেরে নিজেকে আজ ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে।

১৯৮৮ সাল। সর্বজনবিদিত 'স্কুল পলিটিকস্' বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু-র মতো সংক্রামক ব্যধির রূপ নিচ্ছিল দিকে দিকে। আমার স্কুলও তার থেকে মুক্ত ছিল না। আমি তখন বাড়ীতে বসে। স্কুলে যেতে পারছিলাম না। সুকৌশলী পদ্ধতিতে আমার স্কুল যাওয়ার পথে পর্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমি হতভম্ব হয়ে বাড়ীতে বসে চিন্তা করছিলাম, অতঃকিম?

আমার ছাত্র শ্রীমান সুধাংশু রায় আবাল্য স্বয়ংসেবক। মনোমোহনদার স্নেহধন্য এবং তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ। সুধাংশুই মনোমোহনদাকে আমার পরিস্থিতির কথা বলেছিল। হঠাৎ একদিন সুধাংশু সহ মনোমোহনদা আমার কুচবিহার নিউটাউনের ভাড়া বাড়ীতে উপস্থিত। আমার হতাশা ও আশঙ্কাগ্রস্ত মনকে সঞ্জীবনী ঔষধ দিয়ে সবল করার মতো ঘটনা ঘটালেন মনোমোহনদা। আগে থেকে মনোমোহনদার সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ। হাইকোর্টে মামলার জন্য কলকাতায় মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন করে থাকার দরকার হয়ে পড়ত। অথচ কপর্দকশূন্য অবস্থা। কেশবভবনে থাকার ব্যবস্থা মনোমোহনদাই করে দিয়েছিলেন। বীর চিলারায়ের জীবনের উপর একটি ছোট আকারের বই লেখার জন্য মনোমোহনদা আমাকে অনেকবার বলার পরেও আমার মানসিক বিধবস্ত অবস্থার কারণে যখন বইটি লেখা হচ্ছিল না। এমন সময়ে (কলকাতা না বালুরঘাট থেকে ঠিক মনে নেই) মনোমোহনদা কুচবিহার এলে আমার সঙ্গে দেখা হলো। জিজ্ঞেস করলেন, বইটি লেখা হয়েছে কি না। লেখা তো হয়নি। কী বলি? আমি আমতা আমতা করছি, এবং নানান্ অসুবিধার কথা বলছি। মনোমোহনদা তো রেগে অগ্নিশর্মা। বললেন, "আপনি কোনদিনই পারবেন না।" তাৎক্ষণিকভাবে খুব আহত হলাম। লজ্জাও পেলাম দারুণভাবে। ভাগ্য ভাল, আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, অথবা কেউ থাকলে বোধহয় মনোমোহনদা এভাবে আমাকে লজ্জাও দিতেন না। মনে মনে তখনই সংকল্প নিলাম, 'আজ রাতের মধ্যে বইটি লেখা শেষ করবই।' ইতিহাসধর্মী পুস্তিকা হলেও এটি আমার কাব্যিক নিবেদন। এছাড়া আমার উপায় ছিল না। বিভিন্ন বই পুস্তক ঘেঁটে তথ্যনিষ্ঠ বই লিখতে গেলে তো একরাতে বইটি লিখে শেষ করতে পারতাম না। আমার সংকল্প ছিল ওই রাতেই বইটি লেখা শেষ করে পরের দিন সকালেই মনোমোহনদার হাতে পাণ্ডুলিপি তুলে দেব।

সকাল সকাল তৈরি হয়ে পাণ্ডুলিপিখানা সঙ্গে নিয়ে সুধীশদা (প্রয়াত সুধীশ কুমার মজুমদার)-এর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। সেদিন রাতে মনোমোহনদা সুধীশদার বাড়ীতেই ছিলেন।

মনোমোহনদা সঙ্গে সঙ্গে সুধীশদার উপর বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। তাই বইটির প্রথম প্রকাশক সুধীশদাই। কুচবিহার ক্লাবে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুচবিহারের বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতিতে বইটির উদ্বোধন করার পরিকল্পনাটিও মনোমোহনদার চিন্তাপ্রসূত। আমার প্রতি মনোমোহনদার এই স্নেহ সরস ও ভালবাসার ঋণ অপরিশোধ্য।

ঠাকুর পঞ্চাননের স্বপ্ন ছিল, উত্তরবঙ্গের মাটিতে আদর্শ ক্ষত্রিয় চরিত্র সৃষ্টি করা। এইরূপ চরিত্র সৃষ্টি করার মানসেই ঠাকুর পঞ্চানন উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজের মধ্যে সংস্কারদান কাব্যটি সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর মনস্কামনা, খুব বিলম্বে হলেও, ফলপ্রসূ হচ্ছে ধাপে ধাপে। মনোমোহনদা ঠাকুর পঞ্চাননের বাঞ্ছিত চরিত্রদের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি বৈদিক কাব্যিক-সংস্কৃতির পূজারী ও বিদগ্ধ ব্যক্তির প্রতি যেমন বিনম্র ও শ্রদ্ধাবনত ছিলেন তেমনি বিপরীত চরিত্রের ব্যক্তিদের প্রতি uncompromising-ও ছিলেন। আবার সর্বভারতীয় স্বাভিমানবোধ যেমন তাঁর ছিল, তেমনি নিজে রাজবংশী কুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় বলেও তাঁর তুল্যমূল্য স্বাভিমানবোধ ছিল।

মনুষ্যজীবনে দুটি পরিণতি থাকতে দেখা যায়। একটি হলো—কী উপভোগ করলাম এবং কী হলাম। অন্যটি হলো—কী যাতনা পেলাম এবং কী উপলব্ধি করলাম। নিস্তরঙ্গ ও নীরব অনুভূতি ও উপলব্ধি ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। এই আত্মগোপনের যে আনন্দ। সেটা অপার আনন্দ, এই গোপন বেদনার আনন্দই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির সূচক। গর্ভবতী মা পেটে সন্তান ধারণ করেন, বেদনায় অস্থির হন, তবুও আনন্দে অপেক্ষা করেন, সন্তানের মুখ দেখবেন বলে। আনন্দ ও বেদনা এক আধারেই—এক দেহেই—একীভূত হয়। এইরূপ গর্ভবেদনা সহ্য করার শক্তি এসেছে আমার মধ্যে মনোমোহনদার প্রেরণাতেই। I have long been Pregnant with a thought awaiting still the desired for delivery. কিন্তু অনেক সময়ে সন্তান প্রসবে বাধা সৃষ্টি হলে সন্তান সহ-ই মায়ের মৃত্যুও তো হয়। বলা যায় না, ভবিতব্যটা কী হবে। আর এই জীবন-মৃত্যুর ঘোর সংকটকালেই মনোমোহনদাকে হারালাম। মনোমোহনদার তিরোধানে আর কার কী ক্ষতি হলো জানি না;তবে আমার জীবনে এই ক্ষতির পরিমাণ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পাচ্ছি না। স্বধর্ম, স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে বিশ্বকল্যাণের জন্য আত্মনিবেদন করতে পারলেই মনুষ্যজীবন সার্থক হয়। সেই ভাবনার উৎস হিসেবে কোনও মহত্তর জীবনের সান্নিধ্য যদি কারও জীবনে ঘটে, সে ব্যক্তির জীবন ধন্য। আমার জীবনও ধন্য হয়েছে, মনোমোহনদার মহত্তর জীবনের সান্নিধ্যে।

কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

প্রশান্ত কুমার মণ্ডল।। শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তিনি ও তাঁর ভাই মারা গেছেন। এ যেন রক্তের টান, এ যেন অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। যাঁর নামে এক বাক্যে নতুন ও পুরানো স্বয়ংসেবক সকলই চিনতেন তিনি হলেন মাননীয় 'মনোমোহন রায়'। যিনি বাঁকুড়া জেলার সংঘ কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

মনে পড়ে আমরা তখন খুবই ছোট। মাঝে মধ্যে যখন আমাদের মোলবনা শাখায় যেতেন, তখন বাড়ীতে এলেই তাঁর স্নেহের টানে কোলে বসতাম। আমাদের নানান গল্প বলতেন। সংঘের মাধ্যমে বনভোজন ও শিক্ষাবর্গ হোত পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিয়ে। আমরা এইভাবেই আবাল্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত।

বিভিন্ন সময়ে যখন কলকাতা কেশব ভবনে আসতাম তখন দেখা হলে আদরের ডাকে কাছে নিয়ে বসাতেন, এমনকী জোর করে চা ও টিফিন খাওয়ার মাঝে পুরানো কর্মক্ষেত্রের স্বয়ংসেবকদের একটির পর একটি নাম ধরে খবর নিতেন। আমাদের মোলবনা গ্রামের বাঁকুড়া জেলার প্রথম একমাত্র সংঘ কার্যালয়, তৈরী হয়েছিল স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে। তার একমাত্র অবদান মনোমোহনদা। সেই কার্যালয় আজও বর্তমান।

তিনি আমাদের বাড়ীর শুধু নন, আমাদের গ্রাম ও অঞ্চলের লোককে যেমন চিনতেন, ঠিক তেমনি তাঁকেও সবাই চিনতেন তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহারে। তাঁর মৃত্যুর খবর প্রতিটি মানুষকে ব্যথিত করেছে।

স্বস্তিকা পত্রিকায় উত্তরবঙ্গের চিঠি নামক একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ওই লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি বাঁকুড়া জেলার চিঠি নামক ছোট ছোট সংবাদ পরিবেশনে অনুপ্রাণিত হই।

তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। তিনি থাকবেন সবারই অন্তরে।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ১৫.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। — ব্যবস্থাপক

মুসলিম সংরক্ষণ

(১ পাতার পর)

মুসলমানদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণকে ধ্বংসাত্মক ও অসাংবিধানিক বলে মন্তব্য করেন। ডঃ যোশী আরও বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের ফলে দেশের মধ্যে এক আড়াআড়ি বিভাজন হবে এবং রাজনৈতিক বাতাবরণ দূষিত হবে। পশ্চাৎপদতা ও গরীবির সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই বলে শ্রীযোশী কড়া মন্তব্য করেন।

'আকুপ্রেসার চিকিৎসা' প্রশিক্ষণ শিবির

কলকাতার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটে সম্প্রতি 'সেবা ভারতী' অনুমোদিত স্বর্গীয় ভাঁওরলাল মল্লাবত সেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে 'আকুপ্রেসার চিকিৎসা' প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। এটি ছিল অষ্টম প্রয়াস। ২০ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সাতদিন ধরে এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেন ডঃ মনমোহন লাখানি ও ডঃ বিজয় হরভজনকা। কুমারী প্রগতি আগরওয়াল শিবির পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

বৈকুণ্ঠনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২৬ জানুয়ারি ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কলকাতার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ডিডবানা নাগরিক সভার উদ্যোগে এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার প্রসিদ্ধ বাঙ্গুর পরিবারের অনেকে এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট শিল্পপতি কেশব বাঙ্গুর 'বৈকুণ্ঠ রথে' পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

মঙ্গল নিধি

উত্তর দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম মানিকোর। সেখানকার জীবনকৃষ্ণ সরকার এবং শিখার বিবাহ উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠানে জীবনের পরিবার সামাজিক কাজের জন্য মঙ্গলনিধি তুলে দিলেন জেলা সঙ্ঘচালক জগদীন্দ্রনারায়ণ সরকার হাতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়। উল্লেখ্য জীবন সরকার কুশমণ্ডি খণ্ডের কার্যবাহ।

→I →I →I

উত্তরবঙ্গের সহপ্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষের দাদা কালিপদ ঘোষ একমাত্র কন্যার শুভ বিবাহ উপলক্ষে হুগলী জেলার বীরপালা গ্রামের নিজস্ব বাড়ীতে সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গকে মঙ্গলনিধি স্বরূপ ১০০১ টাকা সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যকারিণী সদস্য ডাঃ সনৎ বসুমল্লিকের হাতে তুলে দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈত দত্ত মঙ্গলনিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

চীনা পণ্য বয়কট অরুণাচলে

(১ পাতার পর)

মাধ্যমেই ওখানকার সাধারণ মানুষ নিতে চাইছেন বলে জানিয়েছে এ এ পি এস ইউ। তাদের সভাপতি তাকাম তাতুং বলেছেন, " 'বয়কটে'র মাধ্যমে আমরা চীনের কাছে এই বার্তাই পাঠাতে চাইছি যে অরুণাচল হলো ভারতবর্ষেরই 'অবিচ্ছেদ্য' অঙ্গ।" একইসঙ্গে তাতুং আরও একটা বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। তিনি বলছেন, "অরুণাচলপ্রদেশে চীনের প্রভাব বাড়া নিয়ে ভারতের 'দুর্বল কণ্ঠস্বরে'র দরুণ গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে সেখানকার স্থানীয় জনজাতিদের একটা 'হতাশা' গ্রাস করছে।" স্পষ্টতই এ এ পি এস ইউ-এর 'তির' চীনা আগ্রাসন নিয়ে নয়াদিল্লীর 'নরম' মনোভাবের দিকে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ—২০০৭-এর আগস্টে জনৈক চাবে চাদের যিনি উচ্চ সুবাংসিরি জেলার তাকসিং 'সার্কেলে' অবস্থিত গুমসিং তিয়াং গ্রামের বাসিন্দা, তাঁকে আসাফিলা সীমান্ত থেকে 'গ্রেপ্তার' করে নিয়ে যায় চীনের সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। তাঁকে ছাড়াতে এখনও অবধি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোনওরকম 'সদর্থক' ভূমিকা নেওয়া হয়নি।

এ এ পি এস ইউ-এর দাবী—ভারত সরকারের আচরণ একদিকে যেমন চীনকে অরুণাচল সীমান্তে 'ষড়যন্ত্রে' উৎসাহিত করছে, অন্যদিকে তেমন অরুণাচলবাসীকেও 'নিরাপত্তাহীনতা' ও 'উদ্বেগে'র মধ্যে রাখছে। সব মিলিয়ে 'উন্নয়ন' নামক প্রক্রিয়া থেকে বহু দূরে এখন অরুণাচল প্রদেশ। সেইজন্য কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের তোয়াক্কা না করে জনমনে আত্মবিশ্বাস এবং অরুণাচল ভূমির ওপরে স্থানীয় অধিবাসীদের 'অধিকারবোধ' জাগাতে 'স্বতঃপ্রণোদিত' হয়ে এ কাজে নেমেছে এ এ পি এস ইউ। প্রসঙ্গত, গত অক্টোবরে তারা দিল্লীর চীনা দূতাবাসের সামনে 'অবস্থান বিক্ষোভ' করেছিল। এখন চীনের 'আগ্রাসনের' বিরুদ্ধে 'জনসচেতনতা' তৈরিতে নেমেছে তারা।

রাজ্য রাজনীতি

বিপর্যয় থেকে বাঁচার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সি পি এম

নিশাকর সোম

সদ্য সমাপ্ত হলো সি পি এমের রাজ্য কমিটি এবং বর্ধিত রাজ্য কমিটির সভা। সভার সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিশদে বলার আগে আমাদের কাগজের এই কলামের পূর্ববর্তী একাধিক লেখার কথা উল্লেখ করতে চাই। সি পি এম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে নতুন যে পাঁচজন সদস্যকে কো-অপ্ট করা হয়েছে, তাঁদের চারজনের নাম আমাদের এই কলামে লেখা হয়েছিল। বিশেষ করে দীপক সরকার এবং শ্রীদীপ ভট্টাচার্যের নাম এরাজ্যের যে কোনও পত্র-পত্রিকার পূর্বেই আমাদের লেখায় বলা হয়েছিল। হাওড়া জেলার সম্পাদক শ্রীদীপ ভট্টাচার্যকে এবং অমিয় পাত্রকে (বাঁকুড়া) উন্নীত করার কথা লেখা হয়েছিল। অমিয় পাত্র বাদ পড়েছেন, পরিবর্তে যোগ হয়েছেন নৃপেন চৌধুরী। এই গৌরচন্দ্রিকা আত্মশ্লাঘার জন্য বলছি না, আমরা বলতে চাই, আমাদের সংবাদের সূত্র তথ্যনির্ভর। যাক সে কথা।

এখন দেখা যাক, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে নতুনদের গুণাগুণ সম্পর্কে অনেক মুখোরোচক সংবাদ বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশ হয়েছে। কাজেই সে ব্যাপারে বিশদে যাচ্ছি না।

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে নতুন পাঁচজনকে নেওয়ায় একটি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। সেটি হলো, সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধমান গোষ্ঠীকে 'টাইট' করার ব্যবস্থা রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু করলেন। তিনি অনেকদিন সময় নিয়েই নানা চিন্তাভাবনা করে এঁদের নিয়েছেন। প্রথমেই বলা দরকার, এই প্রথম সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক-মণ্ডলীতে একজন মহিলা অর্থাৎ শ্যামলী গুপ্তকে নেওয়া হল। শ্যামলী গুপ্তর কাকা সি পি আই নেতা অজয় দাসগুপ্ত। ভাই রানা সি পি আই প্রার্থী হিসাবে পুরনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরেছেন। শ্যামলীর একমাত্র সন্তান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান। শ্যামলীকে নিয়ে রসিদ-কাণ্ডে বহু ঝামেলা হয়েছিল। শ্যামলী পার্টি থেকে সাসপেণ্ড হয়েছিলেন। এরপরে বনানী বিশ্বাসের বিদায় সুনিশ্চিত। বনানী বিশ্বাস অবিভক্ত পার্টিতে ব্রাঞ্চ সম্পাদক হতে পারেননি। কেবল মায়ের (কাকিমা) জোরে এতই উত্থান যে, কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান। যেখানে মিনতি ঘোষ, ইলা নন্দী, রেখা গোস্বামীর মতো নেত্রী রয়েছেন, কেবলমাত্র 'ইয়েসম্যান' (সরি উইম্যান) হওয়ার জন্য বনানীর উত্থান!

রবীন দেব বহু কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করে শুধু দূরদর্শন নয়, পার্টিকর্মীদের সামনেও এসেছেন। কিন্তু তাঁর বালিগঞ্জ এলাকার লোকাল ও জোনাল কমিটির বহু সদস্যই তাঁকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন। কলকাতা জেলার এক সম্মেলনে রবীন দেবকে কমিটি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। পরে জ্যোতি বসুর হস্তক্ষেপে কো-অপ্ট করা হয়। বস্তুত, কলকাতা পার্টি রবীন দেবের উত্থানে মোটেই খুশি হয়নি।

এবার জানা দরকার, পশ্চিম মেদিনীপুরে একচ্ছত্র নেতা দীপক সরকারের অন্তর্ভুক্তির কারণ— (১) তিনি নিজের জেলায় পার্টি

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

রবীন দেব

দীপক সরকার

শ্যামলী গুপ্ত

নৃপেন চৌধুরী

বিরোধী দলগুলিকে বিশেষ ট্যাঁ-ফু করতে দেননি। শুধু তাই নয়, তিনি বিগত পার্টি সম্মেলনে তাঁর জেলাতে কোনও স্তরের সম্মেলনে কোনও বিরোধিতা করতে দেননি। সবস্তরেই সর্বসম্মতভাবে নতুন কমিটি তৈরি হয়েছিল দীপকবাবুর মনিটরিং-এর জন্য। এছাড়া গণপ্রতিরোধ করে বিরোধী হটাও অভিযানের নেতা তিনি। এই গণপ্রতিরোধের স্লোগান দেখে মনে হয়েছে সি পি এম চীনের নিন্দিত এবং মৃত নেতা লিন-পিয়াও-এর লাইন কি নিয়ে ফেলছে।

লিন পিয়াও-এর তত্ত্ব ছিল— একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যে জনগণকে জড়ো করার জন্য রাজনৈতিক প্রচার এবং জনগণকে সংগঠিত করা। তারপর তাঁদের অস্ত্রধারী করে তোলা। এব্যাপারে দীপক সরকার খুবই পটু। দীপকবাবু একটু রাফ অ্যাণ্ড টাফ্। বলতে পারা যায়, প্রায় প্রোটোটাইপ প্রমোদ দাশগুপ্ত। দীপকবাবু স্বেচ্ছায় অধ্যাপনা ছেড়ে অবিভক্ত মেদিনীপুরের নেতা হন বিপ্লবী সুকুমার সেনগুপ্তর আমলে। তিনি পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক ছিলেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বোর্ডের সভাপতি থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু কথাবার্তা সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। যাই হোক, দীপক সরকারই সি পি এম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে একটি বিশেষ স্থান নেবেন। বিতাড়িত যুব নেতা শিবরাম বসু, ডহরেশ্বর সেন প্রমুখরা কি বলেন? দীপকবাবু পার্টিতে গণতন্ত্রের চেয়ে কেন্দ্রিকতায় বেশি বিশ্বাস করেন। একথা আজ একটু ঝুঁকি নিয়ে বলতে চাই, আগামী দিনে দীপক সরকারই রাজ্য পার্টির সম্পাদক হবেন। দীপক সরকারের অন্তর্ভুক্তিতে ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্রর মন্দভাগ্য কি উপস্থিত!

ইতিপূর্বেই এই কলামে লেখা হয়েছিল, হাওড়ার জেলা সম্পাদক শ্রীদীপ ভট্টাচার্যকে তত্ত্বজ্ঞান দেবার জন্যই সম্পাদকমণ্ডলীতে আনা হয়েছে। তিনি কার্যত গৌতম দেবের মতো লেখার কাজ করবেন এবং পার্টি পত্র-পত্রিকার মনিটরিং ও পার্টিশিক্ষার কাজে নিযুক্ত হবেন। ফলে তাঁকে জেলা পার্টির সম্পাদকের পদ হয়তো ছাড়তে হবে। বস্তুত তিনি হাওড়া জেলা কমিটিতে তাত্ত্বিক নেতা বলে স্বীকৃত। সাংগঠনিক নেতা হলেন বিপ্লব মজুমদার। শ্রীদীপবাবু সম্পাদকমণ্ডলীতে আসার ফলে দীপক দাশগুপ্তর রমরমা কমবে। দীপক দাশগুপ্তকে পূর্ব মেদিনীপুরের দায়িত্ব দেওয়া ছিল। তিনি ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছেন। সর্বশেষ কথা হল শ্রীদীপ ভট্টাচার্যের স্ত্রী স্বপ্না ভট্টাচার্য হাওড়ার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। যেমন, প্রাক্তন সাংসদ স্বদেশ চক্রবর্তীর কন্যাও কমিশনার। নতুনদের মধ্যে নৃপেন চৌধুরী সব থেকে শান্ত এবং প্রচারবিমুখ। তিনি জেলার পার্টির মধ্যে অধিকাংশেরই আস্থাভাজন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সি পি এম নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী এবং ঠেঁটকাটা রেজ্জাক মোল্লাকে না নেওয়ার জন্য অনেক কথা উঠেছে। কোনও সংবাদপত্র তাঁকে না নিয়ে মুসলিমদের অবজ্ঞা করা হয়েছে বলে লিখেছে। আসলে রেজ্জাক মুসলিমদের উস্কানি দিয়ে চলেছেন। কংগ্রেস আজহার ও ঘুটিয়ারি শরিফের পীরজাদা ত্বহাকে দিয়ে মুসলিম কার্ড খেলেছে। মমতাদেবী স্বয়ং মুসলিম ধর্মাবলম্বী সাজেন। নমাজ-ইফতার-মহরমে মিছিলে হাঁটছেন। এইসব কাজগুলি কি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়? সি পি এম তো মালদহে মহম্মদ সেলিমকে দায়িত্ব দিয়ে মুসলিম তাস খেলতে বলেছে। যত দোষ নন্দ ঘোষ— যদি কেউ বলেন, হিন্দুদের ঐক্য চাই, তিনি হয়ে যান সাম্প্রদায়িক। ধন্য রাজনীতির খেল! রেজ্জাক সাহেবকে শুধু বুদ্ধদেববাবু অপছন্দ করেন তাই নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগণার একাধিক নেতা-মন্ত্রী তাঁর বিরোধী। এ সমস্ত টানাপোড়েনে বুদ্ধদেব-বিমান এক হয়ে নিরুপম-বিনয় কোঙার-মদন ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছেন। আরও ঘটনার জন্য পাঠক অপেক্ষা করুন। শেষ

(এরপর ১৩ পাতায়)

অন্য রকম

সংস্কৃত পপগায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ওই যে দেখছেন টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে একটা চশমা, খুব সন্তর্পণে সেটা চোখে গলিয়ে নিন। কারণ সংস্কৃত-র বিশ্বরূপ দর্শনের একটা মওকা পাওয়া গেছে।

যেমন-তেমন চশমা এটি নয়। ফ্রেমটা চৈনিক লাল। কিন্তু কাঁচটা স্বচ্ছ, যদিও বাইফোকাল। পরলেই বুঝতে পারবেন। পরেছেন যখন, বাইরেটাও দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। বাইফোকালের দিকে এখনই তাকাবার দরকার নেই।

ভালো করে দেখুন, আপাদমস্তক তিব্বতী পোশাক পরা এই ভদ্রমহিলাকে। এঁর নাম সা ডিংডিং। ইনি থাকেন দক্ষিণ চীনের সাংডং প্রদেশে। স্নাতক অবধি পড়াশোনা। পিউপিল'স লিবারেশন আর্মি পরিচালিত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস থেকে এই ডিগ্রীটি অর্জন করেছেন। বেশ কয়েকটি ভাষা এঁর আয়ত্তে। যেমন— মঙ্গোলিয়ার আঞ্চলিক ভাষা, তিব্বতী এবং সংস্কৃত। পেশায় ইনি একজন পপ গায়িকা।

বেশ নামডাক করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। ২০০৮ সালে বিবিসি রেডিও 'এশিয়া প্যাসিফিক্ ক্যাটিগরি'-তে এঁর হস্তে তিনটি পুরস্কার সমর্পণ করেছে। প্রথম চীনা হিসেবে আমেরিকার গ্র্যামী সম্মানও করায়ত্ত করেছেন ইনি।

এনার এত নাম-ডাকের কারণ জানেন? জানলে পরে ভীষণভাবে চমকে উঠতে পারেন। সেই কারণে মনটাকে সংহত করার চেষ্টা করতে হবে বৈকি! যাক গে, শুনে রাখুন সা ডিংডিং হলেন একজন সংস্কৃত পপ-স্টার। ঘাবড়ে গেলেন নিশ্চয়ই। তিব্বতের সরকারি ওয়েবসাইটে যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে— "একজন সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে তিনি (ডিংডিং) তাঁর খ্যাতির যাবতীয় অভিমান

সা ডিংডিং

ঝেড়ে ফেলে নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত শিখেছেন। এই নতুন ভাবমূর্তিতে তিনি সকলকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছেন।" এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়ার কারণটা ভাল করে বুঝতে ভদ্রমহিলার মুখমণ্ডলটি দেখার চেষ্টা করুন। হান আর মঙ্গোলীয় ছাঁচে ঢেলে ভগবান যেন এই মুখখানি তৈরি করেছেন। মহামতী বুদ্ধ একটা সময় এঁকে খুব আকর্ষণ করে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মানোর পরই তিনি বাপ-দাদার মারকাটারি ধর্মকে পরিত্যাগ করে তিব্বতী ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন বেজায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিল প্রাদেশিক সরকার। বেশ কিছু দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিশ্ব সঙ্গীতের দরবারে পৌঁছোতে। কিন্তু গ্র্যামী প্রতিযোগিতায় অন্যতম বিচারক এরিক টি জনসনের সমাদর পাবার পর সেই ফেলা থুতু এখন চাটতে হচ্ছে সরকারকে। কারণ, সেই সরকার ভেবেছে মে মাসের সাংহাই ওয়ার্ল্ড এক্সপোয় ডিংডিং-এর নৃত্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে প্রভূত লাভ ওঠাবে।

জানি, এসব এমনিও দেখতে পাওয়া যেত। কারণ, আপনার চোখ খুব ভাল। কিন্তু প্রথমে মেকলেপুত্র আর পরে মার্কসের মানসপুত্রদের পাল্লায় পড়ে আপনি ভারতীয় সংস্কৃতির যাবতীয় পরাকাষ্ঠা ভুলতে বসেছেন। আপনি ভুলে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন পরম্পরা প্রবাহিত ছিল সাংহাই নদীর তীরে চীন দেশেও। তাই চশমাটা আপনার পক্ষে জরুরি।

এবার চোখ রাখুন বাইফোকাল লেন্সে। দেখুন, তিব্বতে বইছে ভারতীয় সংস্কৃতিরই পরম্পরা। চীনের কোনও ছাপ সেখানে নেই। এটা আপনাকে ভুলিয়েছিল চীন দেশের মাওয়ের মানসপুত্ররা।

লস্করের ব্যবসায়িক-জাল বাংলাদেশে

গাফফার খান চৌধুরী ॥ দেশী-বিদেশী জঙ্গিরা বাংলাদেশে চোরাচালান, ওষুধ ব্যবসা ও জাল টাকার ব্যবসাসহ নানা ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। বিশেষত মানুষকে অজ্ঞান করে সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত এটিভিএন ট্যাবলেটের ঢাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে দেশী-বিদেশী জঙ্গিরা। রাজধানীতে অন্তত শতাধিক ওষুধের দোকান রয়েছে জঙ্গিদের। ব্যবসার মূলধন দিচ্ছে লস্কর-এ-তৈবা ও একটি বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা। পাকি-লস্কররা পাকিস্তান থেকে এটিভিএন ট্যাবলেট আমদানি করছে। আমদানিকৃত ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশী জঙ্গিদের পরিচালিত নির্দিষ্ট দোকানে। রাজধানীতে গরম যত বাড়ে পাকিস্তান থেকে মানুষ অজ্ঞান করার ট্যাবলেট আমদানিও তত বাড়ে। গরম অসহনীয় পর্যায়ে গেলে বাংলাদেশে থাকা পাকি-লস্কর জঙ্গিদের ইনকামও তত বাড়তে থাকে। গোয়েন্দারা বলছে, রাজধানীতে গরম বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে অজ্ঞান পার্টি ও দেশী-বিদেশী জঙ্গিদের তৎপরতা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পাকিস্তান থেকে অজ্ঞান করার ট্যাবলেট এটিভিএন আমদানি। গরম বাড়লে এসব ট্যাবলেট শরবত বা ডাবের জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো হয় পথচারীদের। কেড়ে নেওয়া হয় সর্বস্ব। রাজধানীতে পুরো চক্রের অন্তত পাঁচশো সদস্য সক্রিয় রয়েছে। এ চক্রের সঙ্গে বেশকিছু হকারের যোগাযোগ রয়েছে। এসব হকারের মাধ্যমেই নানা ধরনের খাবারে, শরবতে বা ডাবের জলেতে অজ্ঞান করার এটিভিএন ট্যাবলেট মেশানো হয়। এরপর যাকে খাওয়ানো হবে তাকে চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও পালন করে হকাররা। গত ১৮ জানুয়ারি ১০ লাখ জাল ভারতীয় টাকাসহ পাকিস্তানী নাগরিক দানিশ ও সারিবর গ্রেফতার হয়। পরে তাদের তথ্য মতে, ২০ জানুয়ারি আরেক পাকিস্তানী নাগরিক মোহাম্মদ জাহিদকে ৫০ হাজার ভারতীয় জাল মুদ্রাসহ গোয়েন্দারা গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে পাকিস্তানী নাগরিকরা গোয়েন্দাদের জানায়, বাংলাদেশের সিংহভাগ চোরাচালান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পাকিস্তানের করাচীতে তৈরি জাল বৈদেশিক মুদ্রায়। পাকিস্তান থেকেই বাংলাদেশে অবস্থানকারী অন্তত অর্ধশত পাকিস্তানীর মাধ্যমে এই চোরাচালান নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রায় ১০ বছর ধরে বাংলাদেশে চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করছে তারাই। ব্যবসা থেকে আয়ের একটি বড় অংশ চলে যাচ্ছে বাংলাদেশী জঙ্গিদের কাছে। এসব টাকায় জঙ্গিদের বিদেশে ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি দেশে জঙ্গিরা ব্যবসা করে থাকে। এর আগে গত ১২ অক্টোবর গাজীপুর থেকে লস্কর-এ-তৈবার সদস্য পাকিস্তানী নাগরিক সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম আজহারী ওরফে সুফিয়ান, মোহাম্মদ আশরাফ ওরফে জাহিদ ও মোহাম্মদ মনোয়ার আলী ওরফে মনোয়ার গ্রেফতার হয়। গত ৪ নভেম্বর ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে হামলার চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে চট্টগ্রামের লালখান মাদ্রাসা থেকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবার সঙ্গে সম্পর্কিত ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ইসলামের ছেলে হারমন ইজাহার, সুজন ও সাইফুলকে গ্রেফতার করা হয়। মুফিয়ান বাংলাদেশে লস্কর-এ-তৈবার সদস্যদের আশ্রয় দেওয়া, সদস্য সংগ্রহ ও তাদের পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করত। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রেফতার হওয়া পাকিস্তানী জঙ্গিরা স্বীকার করেছে, লস্কর জঙ্গিদের এদেশে জামা-কাপড় ছাড়াও ওষুধ ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির ব্যবসা রয়েছে। ধৃতরা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিল। এছাড়া গ্রেফতারের বাইরে থাকা দেশী-বিদেশী, বিশেষ করে পাকিস্তানী লস্কর জঙ্গিরা ওষুধ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। মিটফোর্ড-কেন্দ্রিক এটিভিএন ট্যাবলেট বিক্রি হয়ে থাকে। এসব ট্যাবলেটও বিক্রি হয় বাংলাদেশী জঙ্গিদের পরিচালিত দোকানে। তোপখানা রোডের বড় ওষুধের দোকান তাজ ফার্মেসিটি ধৃত লস্কর জঙ্গিদের। লস্কর-ই-তৈবার টাকায় ফার্মেসিটি দীর্ঘ দিন ধরে ওষুধের ব্যবসা করে আসছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে দক্ষিণে নারী-শিশু পাচার

সংবাদদাতা ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য থেকে সুদূর দক্ষিণ ভারতে ব্যাপকহারে শিশুপাচার হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ এবং সি বি আই তদন্তের দাবী জানালো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ওই বেসরকারি সংস্থাটির নাম—'শক্তি বাহিনী'। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির উদ্যোগে গত ২৫ জানুয়ারি তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী জেলার একটি ভুঁইফোঁড় চিল্ড্রেন হোম থেকে ৭৬ জন শিশু ও কিশোরকে উদ্ধার করা হয়েছে। ওইদিন সকালে শিশু অধিকার রক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিশনের চেয়ারপার্সন শান্তা সিন্‌হা কন্যাকুমারীতে ছুটে গিয়েছিলেন। কন্যাকুমারী জেলার কুলিতরাই চিল্ড্রেন হোম থেকে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদের উদ্ধার করা হয়। একাজে সহায়তা করেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য জনৈক প্রভাকরণ।

শ্রীপ্রভাকরণ বলেছেন, ওই হোমে শিশু-বালকরা এক ভয়াবহ পরিবেশে জীবনযাপন করছিল। তাদেরকে ওখানে জোর করে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছিল। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কর্মকর্তারা উত্তরপূর্বাঞ্চল থেকে পাচার হওয়া শিশু-বালকদের উদ্ধার করল।

পাচারকারীদের হাত থেকে উদ্ধার হওয়া তিনটি মেয়ে (ফাইলচিত্র)।

সূত্রমতে, ৭৬ জন শিশু তামিলনাড়ুর অনথিভুক্ত বা আনরেজিস্টার্ড Bedesta Blessing Home-এ নারকীয় পরিবেশ জীবনযাপন করছিল। সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে, ওই হোমের পরিকাঠামো এবং খাওয়া-দাওয়ার মান খুবই নিম্নমানের।

উদ্ধারকৃত ৭৬ জনের মধ্যে ৫৪ জনই মণিপুরের, বাদবাকীরা অসমের। ২০০৯-এর জুলাই মাস থেকেই ওই শিশুদের ওখানে রাখা হয়েছিল। শক্তিবাহিনী, বিকল্পধারা এবং কয়েকটি অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সি বি আই তদন্তের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। শক্তিবাহিনীর (এন জি ও) সভাপতি রবিকান্ত বলেছেন, "এসবই বিশৃঙ্খলার সংকেত। উত্তরপূর্বাঞ্চল এবং হিমালয় সন্নিহিত এলাকা থেকে এই শিশু পাচার এক ভয়াবহ দিক নির্দেশ করছে। আমরা সকল ঘটনা ও তথ্য সংকলন করছি। তবে এসবই বাস্তবের এক ভগ্নাংশ মাত্র—হিমবাহের চূড়া। এরকম ধারণা করা যেতেই পারে যে, এক সংগঠিত নেটওয়ার্ক উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে নারী-শিশু পাচারে সক্রিয়।"

শ্রীরবিকান্ত এ ব্যাপারে দ্রুত সি বি আই তদন্তের দাবী জানিয়েছেন।

সন্ত্রাসের উৎসসন্ধানে সংসদীয় সম্মেলন

সংবাদদাতা।। ক্ষীণ যোগাযোগ, বিভিন্ন জনজাতিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অজ্ঞতা, দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণেই উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে সন্ত্রাসবাদের সমস্যা ব্যাপক আকার নিয়েছে। গত ২৯ জানুয়ারি শিলংয়ে মিলিত হয়েছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল সংসদীয় সমিতির কর্মকর্তারা (নর্থ ইস্ট রিজিয়ন কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন)। এটা ছিল দ্বাদশ সম্মেলন। সমিতির আলোচনার বিষয় ছিল "উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সন্ত্রাসবাদের প্রভাব এবং সমাধান'। অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন বিধানসভার স্পীকার (পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম সহ) এবং ভারতীয় সংসদের বিভিন্ন পদাধিকারীরা। কারও কারও মতে, ক্ষীণ জনসংযোগের কারণে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের সুযোগ সুবিধার কথাই পৌঁছে দেওয়া যায় না, চিকিৎসালয়ে আসার আগেই মানুষ মারা যায়। সর্বসাধারণ জনতা তাদের বাকী ভারত থেকে পৃথক বলে মনে করেন। সেজন্য অবশিষ্ট ভারতবর্ষকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে মানসিক সংযোগ স্থাপন করতে হবে। সঠিকভাবে বুঝতে হবে। জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয়তা দেখাতে হবে। লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেল পি আচার্য বলেন, কেন্দ্র যে অর্থ বরাদ্দ করে তার সুফল তৃণমূল স্তরে সাধারণের কাছে পৌঁছায় না। তিনি আরও বলেন, দুর্বল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, সুসংবদ্ধ নীতির অপ্রতুলতা, প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে। সন্ত্রাসবাদকে অকার্যকর করতে হলে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা, দুর্বলতা, দুর্নীতি দূর করতে হবে। ত্রিপুরা বিধানসভার স্পীকার রতন দেবনাথ বলেন, সন্ত্রাসবাদ হলো অনুন্নয়নের পরিণতি। আর এই সন্ত্রাস রাজ্যের উন্নয়নকে ব্যাহত করে চলেছে। নাগাল্যাণ্ড বিধানসভার স্পীকার কে পিসিই বলেন, পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হলো সন্ত্রাসবাদ।

তাঁর কথায়, সারা ভারতেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস, জনজাতিদের বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি বিষয়ে ভুল ধারণা রয়েছে। এগুলির নিরসন প্রয়োজন।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি সম্মেলন

ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কথায় আছে, 'কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে'। ভারত সরকার দেখে কিংবা ঠেকে উভয়ের কোনওভাবেই শেখার কোনও লক্ষ্মণ দেখাচ্ছেনা। এই 'দেখে শেখা'র সাম্প্রতিক নমুনাটি হলো, গত ৪ ফেব্রুয়ারি পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি সমাবেশ করল কট্টর ভারতবিরোধী পাকপন্থী জঙ্গি সংগঠনগুলি। আর 'ঠেকে শেখার' জ্বাজল্যমান দৃষ্টান্তটি হলো গত ৩ ফেব্রুয়ারি হুজি জঙ্গিদের প্রতি আক্রমণে মৃত্যু হয় এক ভারতীয় সৈনিকের। এতসবের পরেও কোনওরকম শিক্ষা হলো না কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের। যে কারণে, সেদিন ভারতীয় সৈনিকটি মারা গেলেন, ঠিক তার পরের দিন এবং পাক-কাশ্মীরে জঙ্গি সমাবেশের দিনই নয়া দিল্লীর তরফ থেকে ইসলামাবাদকে বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠকের প্রস্তাব দেওয়া হয়। আসলে তখনও অবধি ঠিক ছিল আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সম্মেলনে যোগ দিতে ইসলামাবাদে যাবেন এদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম। কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতিতে নেপালের গৃহমন্ত্রী আসতে পারবেন না— এই অজুহাতে পুরো সার্ক সম্মেলনটাই স্থগিত হয়ে যাবার পর ভারত চেষ্টা করছে আরও আগে পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে।

যাই হোক, সেখানে যাতে তাঁকে জামাই আদর করা হয় সেজন্যই নয়াদিল্লী আগবাড়িয়ে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিন চাপ। তালিবানী সন্ত্রাস ঠেকাতে পাকিস্তানকে হাতে রাখার জন্যই ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে চাপ দিচ্ছে আমেরিকা। যার আভাস পাওয়া গিয়েছে পাক আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী

সৈয়দ সালাউদ্দিন

রেহমান মালিকের কথায়। তিনি 'ফলপ্রসূ ও সুসংহত আলোচনা'র জন্যই নাকি পি চিদাম্বরমকে স্বাগত জানাতে তৈরি।

রেহমান মালিকের এহেন 'আলোচনা' যে জম্মু-কাশ্মীর অধিগ্রহণের স্বার্থেই তা আরও একবার প্রমাণ করল লস্কর-এ-তৈবা, হিজবুল মুজাহিদিন, জামাত-উদ-দাওয়ার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি। গত ৪ ফেব্রুয়ারি পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি সমাবেশের মাধ্যমে সেইসব জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি ভারতবর্ষের অঙ্গ জম্মু-কাশ্মীরের 'স্বাধীনতা যুদ্ধে'র জন্য সরাসরি জিহাদের ডাক দিল। ইতিমধ্যেই মার্কিন সেনেটে সেদেশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ডেনিস ব্লেয়ার সরাসরি মন্তব্য করেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে এইসব জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি পাকিস্তানের স্ট্র্যাটেজিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যার চূড়ান্ত প্রমাণ সৈয়দ সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে মুজফ্‌ফরাবাদে সেদিন যে মিছিলটি সংগঠিত হয়, তাতে এমন অনেকেই ছিল যাদের ভারত বরাবরই নিজেদের হাতে পেতে চাইছে। তারাই গত ৪ ফেব্রুয়ারি 'কাশ্মীরে ভারতীয়দের জীবিকা'র বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে। মার্কিন সেনেটের বিশেষ একটা মহল এটাই মনে করছে, জিহাদ প্রদর্শনকারীরা পাক মদতেই ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়া করেছে। ১৬ সদস্যের ইউনাইটেড জিহাদ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সৈয়দ সালাউদ্দিন বলেছে, "শুধুমাত্র কথাবার্তা চালিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। একমাত্র জিহাদই পারে ভারতের হাত থেকে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে আনতে। সুতরাং সমস্ত মুসলিম ভাইদের বলছি, তারা যেন সীমা পেরিয়ে ভারতের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে তাদের কাশ্মীর ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন। জামাত উদ দাওয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় অপপ্রচারেরও জবাব দিন তাঁরা।"

সালাউদ্দিনের এই ধরনের কথাবার্তার পরেও যদি ঘুম না ভাঙ্গে ভারত সরকারের তবে আর কিভাবে ভাঙ্গবে!

গুজরাতে উপকূল রক্ষায় বাইক-র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নিঃসন্দেহে অভিনব বাইক-র‍্যালি। র‍্যালির উপাদান অর্থাৎ বাইকে বিন্দুমাত্র অভিনবত্ব না থাকলেও, র‍্যালির উদ্দেশ্য ও আয়োজনে বিলকুল অভিনবত্ব রয়েছে। গুজরাত জুড়ে রয়েছে দীর্ঘ বিস্তৃত সামুদ্রিক উপকূল। ২৬/১১-এর ঘটনার নিদারুণ অভিঘাতে শঙ্কিত গুজরাতবাসী মুম্বইয়ের ওই ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি চাইছেন না। সেই কারণে শুধুমাত্র প্রশাসন আর গোয়েন্দাদের ভরসায় না থেকে সাধারণ মানুষও যাতে এনিয়ে দায়িত্ব সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন, সেই কারণে ১০ সদস্যের একটি বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। আর সেই আয়োজনে রয়েছে উপকূলরক্ষী বাহিনী। গত ১ ফেব্রুয়ারি উত্তর-পশ্চিম উপকূল সীমান্ত থেকে এই যাত্রা শুরু হয়। প্রসঙ্গত, গত ২ ফেব্রুয়ারি উপকূলরক্ষী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ আর মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে এহেন যাত্রা বেশ ভালরকম সাড়া পেয়েছে।

উপকূলরক্ষী বাহিনীর কম্যান্ড্যান্ট বি এন মাহাতো একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, ২৬/১১-এর পর মৎস্যজীবীদের নৌকাগুলোকে যখন-তখন পরীক্ষা করা হয় বলে তাঁরা খুবই বিরক্ত ছিলেন। কিন্তু এই যাত্রার পর তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, তাঁদের সুরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটা সূত্র বলছে, মৎস্যজীবীরা এর ফলে নিজেরাই সচেতন হবেন। এবং কোনও সন্দেহজনক নৌকা সমুদ্রে ঘোরাফেরা করতে দেখলেই তাঁরা যাতে উপকূলরক্ষী বাহিনীকে তা অবগত করেন সেটাও বোঝানো হচ্ছে মৎস্যজীবীদের।

উপকূল রক্ষী বাহিনীর এক আধিকারিক জানান, কিছুদিন আগে সমুদ্রে একটি নৌকায় ৫০০ থেকে হাজার কিলোগ্রাম মাছের তলায় লুকিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের চেষ্টা হচ্ছিল ভারত সীমান্তে।

আমেদাবাদের ধোকলা জেলা থেকে এই বাইক র‍্যালি আরম্ভ হয়। শেষ হয় কচ্ছের জাখাউ-এ। এবং শেষের দিন সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন উপকূলরক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তারা। মৎস্যজীবীদের নৌকায় লাগানোর জন্য ডিসট্রেস অ্যালার্ট ট্রান্সমিটিং সিস্টেম সংক্ষেপে ডি এ টি এস যন্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত, এই ট্রান্সমিটিং সিস্টেমটিকে তৈরি

করেছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। এটি একটি ছোট বাক্সের মতো দেখতে, যার নির্দিষ্ট 'বটন'টিকে টিপলে বিপদসংকেত পৌঁছে যাবে উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে। ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত একটি স্যাটেলাইট সেন্টারের মাধ্যমে এই ট্রান্সমিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইসরোর কাছ থেকে প্রায় হাজারটি ডি এ টি এস নিয়েছে গুজরাত উপকূল রক্ষী বাহিনী। ১৬০০ কিমি বিস্তৃত গুজরাত উপকূলে প্রায় আড়াইশো জন মৎস্যজীবীর কাছে এই যন্ত্রটি সরবরাহ করা হয়েছে।

বাঘের সংখ্যা বাড়ছে কর্ণাটকে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাস্তুতান্ত্রিক সংরক্ষণে (ইকোলজিক্যাল কনজারভেশন) নতুন আলোর দিশা দেখাচ্ছে ভারতবর্ষের দক্ষিণী রাজ্য কর্ণাটক। সৌজন্যে— সাম্প্রতিক ব্যাঘ্র প্রকল্প। প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার বনাঞ্চলকে ঘিরে ছয়দিন ধরে বাঘের সংখ্যা গোণার কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। সেখানকার বনকর্তারা ইঙ্গিত দিচ্ছেন, পুরো কর্ণাটক রাজ্যে ২০০৬ সালের গণনায় বাঘের যে সংখ্যাটা ২৯১ ছিল, এবার তা বেড়ে যেতে পারে অনেকটাই। রাজ্যের মুখ্য বনপাল বি কে সিংহ বলেছেন, "ব্যাঘ্র গণনার পরে আমরা সাফল্যব্যঞ্জক কিছু আশা করছি। এত আগেই যদি বাঘের সংখ্যাটা অনুমান করার চেষ্টা করি, বোধহয় সেটা বোকামিই হয়ে যাবে। ফিল্ডে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এখনও অবধি যা তথ্য-পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে, তা সঠিক কিনা যাচাই করার জন্য আমরা দেরাদুনের ওয়াইল্ড লাইফ ইন্সটিটিউট অফ ইণ্ডিয়ার সাহায্য নিচ্ছি। তাদের 'ক্যামেরা ট্র্যাপিং'-এর মাধ্যমে বাঘের প্রকৃত সংখ্যাটা বেরিয়ে আসবে।"

সরকারি বনদপ্তর সূত্রে 'ফিল্ড ওয়ার্কের' ব্যাপারে যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা হলো, এই প্রকল্পটির পরিকল্পনা করেছে ওয়াইল্ড লাইফ ইন্সটিটিউট অফ ইণ্ডিয়া এবং নতুন দিল্লীর ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে। সমগ্র বনাঞ্চলের প্রায় ২,৮১৯টি প্রান্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা বাঘের থাবা, পায়ের ছাপ, নখের দাগ ইত্যাদি অপ্রত্যক্ষ প্রমাণাদির মাধ্যমে বাঘের সংখ্যা নিরূপণ করার একটা প্রচেষ্টা চালানো হয়। একইসঙ্গে ওয়াইল্ড লাইফ ইন্সটিটিউট অব ইণ্ডিয়ার বিশেষজ্ঞরা এই প্রাথমিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট স্থানে ক্যামেরা ট্র্যাপিং-এর বন্দোবস্ত করেছেন। পরবর্তীকালে উভয় তথ্যাবলী যাচাই করে ব্যাঘ্র গণনার কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে শ্রী সিংহ জানিয়েছেন। ২০০৮ সালে জাতীয় বাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তাতে নাগরাহোল-বান্দিপুর-মুদুমালাই-আনন্দ এলাকার বনভূমিই ছিল বাঘের সংখ্যার নিরীখে সবচেয়ে ওপরের স্থানে এবং দীর্ঘদিন ধরে তাদের বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও একদম ওপরের দিকেই ছিল উক্ত অঞ্চলটি। এলাকাটির আয়তন ১০,৮০০ বর্গ কিমি এবং অনুমান করা হচ্ছে এখানে বাঘের সংখ্যা ১৯০ থেকে ২৩০-এর মধ্যে রয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হচ্ছে যে ব্যাঘ্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তো বটেই সেইসঙ্গে বাঘেরা যাতে আরও অনেক বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট হচ্ছে কর্ণাটকের বনদপ্তর। বিলিগিরি রঙ্গস্বামী মন্দির অভয়ারণ্য এবং কাবেরী অভয়ারণ্যেও বিস্তৃত রয়েছে ভারতের জাতীয় পশুর আস্তানা। কুদ্রেমুখভদ্র এবং মহারাষ্ট্রের ভীমাশঙ্করের একটা অংশ— এই দুটি এলাকা মিলে পশ্চিমঘাট অঞ্চলের বাঘের সংখ্যা ৩৫০-৪০০ মতো নিয়ন্ত্রণ করছে। মাহীশূর ব্যাঘ্র প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং বনপাল বি জে হোসমাট বলেছেন, তাঁরা বাঘেদের দীর্ঘজীবী করতে চান, উপযুক্ত সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তিনি আরও বলেছেন, বাঘেদের জন্য কর্ণাটক হলো নিরাপদ স্বর্গ এবং বাঘের সংখ্যার নিরাপদ বৃদ্ধি তে রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা রয়েছে।"

কেরলের মহিলা সমাজ

তারক সাহা

ভারতে কেরলকে বলা হয় মহিলাদের মিত্র প্রদেশ। কিছু কিছু এমন তথ্য রয়েছে যা দিয়ে বলা যায়, কেরলে মহিলাদের গড়পড়তা অবস্থা দেশের অন্য অঞ্চলের মহিলাদের থেকে ভাল। যেমন কেরলে মহিলাদের গড় আয়ু ৭৭ বছর এবং এর সঙ্গে তুলনা চলে কেবল দেশের অভিজাত বংশের মহিলাদের কিংবা আমেরিকা বা জাপানের মহিলাদের সঙ্গে, যাদের গড় আয়ু ৮০ বছর। উল্লেখযোগ্য যে কেরলে প্রতি এক হাজার পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা ১০৫৮

নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা পাকিস্তানে তালিবানদের হাতে সাতমাস বন্দী অবস্থায় থাকার পর লিখেছেন— "এই অঞ্চলে ৭ বছর রিপোর্টিং করার পর আমার মনে হয়েছে যে, মুসলমানরা পুরো বিশ্বে তালিবানদের মাধ্যমে এক মুসলিম দুনিয়া গড়তে তৎপর।"

জন, যা উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনীয়। আমাদের দেশের অন্যত্র প্রতি হাজার পুরুষের মধ্যে মহিলারা ৯২০ জন। এর থেকে বলা যায়, কেরলে মহিলারা বিশেষ মর্যাদা পান।

কেরলে মহিলাদের শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হারও বেশ উঁচু। কিছু ক্ষেত্র বাদে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। মহিলা ডাক্তার, কারিগরিবিদ, আইনজীবী, শিক্ষক এবং সিভিল সার্ভেন্ট সংখ্যায় অনেক বেশি কেরলে। কিছু কিছু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি।

কেরলে নার্সদের সংখ্যা রীতিমতো উৎসাহজনক। নিম্নবিত্তের পরিবারগুলি বিশেষত খৃস্টান পরিবারভুক্ত মহিলারা এই পেশায় নিযুক্ত হয়ে তাদের পরিবারকে সম্পন্ন পরিবারে পরিণত করেছে। কারণ, নার্স দুহিতারা বিদেশে গিয়ে তাদের আয়ের বিপুল অংশ দেশে পাঠাচ্ছে। শিক্ষিত বেকারত্বের সমস্যাকে পরাস্ত করে কেরলের মহিলারা কীভাবে তাদের পেশাকে কাজে লাগিয়ে উন্নতি করছে তা রীতিমতো কাহিনী। অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির তুলনায় যেখানে মহিলারা কোনও সুযোগই পায় না, সেখানে কেরলের মেয়েরা কখনোই আর্থিক সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েনি।

এছাড়া কেরলীয় মহিলাদের অধিকতর স্বাধীনতা অর্জনের ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। কেরলের হিন্দু সমাজের এক বৃহদংশ মহিলাদের কন্যা পছন্দ। বিশেষত নায়ার, এজহোভাগ সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাই এই প্রদেশের মহিলারা অধিকতর আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করে এবং সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী। এর অন্যতম কারণ হলো, এদের শিক্ষা অর্জনের জন্য উৎসাহিত করা হয়। কেরলের মহিলারা দেশের অনেক ক্ষেত্রে প্রথম। যেমন উচ্চতম আদালতের বিচারক প্রথম কেরলীয় মহিলা, সার্জেন জেনারেল হিসেবে কেরলীয় মহিলা সর্বাগ্রে। আবার হিন্দুদের মধ্যে কন্যাসন্তানের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য অনেক পরিবার তাদের বংশের ধারা বজায় রাখতে নারী জন্মকে উৎসাহ দেয়। এইসব কারণে কেরলে মহিলারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে নিজেদের কেরিয়ারকে সমৃদ্ধ করে এবং তারা ঘরে আবদ্ধ থাকে না।

মুসলিম যুবকরা কেন 'লাভ জেহাদে' উৎসাহী

কেরলে গত ৪ মাসে ২১২টি ছোট-বড় মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাদের হুণ্ডি লুণ্ঠিত, মহার্ঘ্য সামগ্রী চুরি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কালাডি আদি শঙ্করাচার্যের মন্দিরের অমূল্য পাথরের শিবলিঙ্গসহ গহনা, যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। হিন্দুরা এখানে তাদের উপাসনাস্থল আক্রান্ত হওয়ায় ভীত। এছাড়া এখানকার হিন্দুরা সন্ত্রস্ত। কারণ, এদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। হিন্দু, খৃস্টান সমাজ কেরলে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে। পরিবার পিছু দুই সন্তান থেকে তা নেমে এসেছে একটি মাত্র সন্তানে। অন্যত্র মুসলমান সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এদের পরিবার পিছু গড় সন্তান ৩-৪টি।

এসবের পিছনে যেসব কারণ কাজ করছে তা হলো —

(১) ধর্মপ্রচার— সাংবিধানিক শর্ত অনুসারে প্রতিটি নাগরিকের ধর্ম প্রচারের অধিকার আছে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে বা বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ সংবিধানবিরোধী। কিছু মেয়েদের এমন উদারভাবে মুসলমান ধর্ম বোঝানো হচ্ছে এবং তার ব্যাখ্যা শুনে তারা সহজেই ধর্মান্তরিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত বিদ্যালয়গুলি ছাত্রীদের ধর্মের পৌরাণিক তত্ত্ব বা তার ব্যাখ্যা শেখাচ্ছে না। সুতরাং এইসব তরুণ-তরুণীরা সহজেই প্রলুব্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। যদিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সাইটে ধর্মত্যাগী মুসলমানরা বলছে, কেন তারা ধর্মত্যাগ করেছে। কারণগুলি খুব

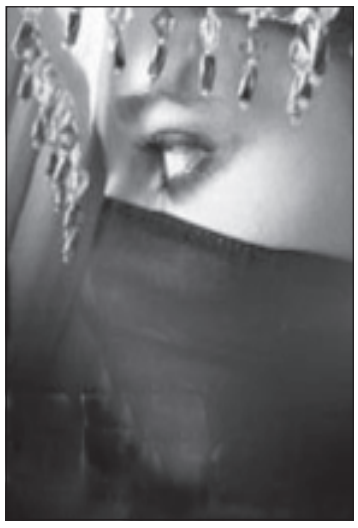

ভয়াবহ এবং বিশেষত তা মুসলিম সমাজে মহিলাদের দমন পীড়নের কাহিনী।

বাস্তব হল, ব্রাহ্মণ মেয়েদের ধর্মান্তরকরণ অনেক বেশি অর্থকরী। খবরে প্রকাশ, জেহাদি ছেলেরা যদি কোনও হিন্দু মহিলাকে ধর্মান্তরিত করতে পারে এবং সেজন্য কীভাবে জাতের ভিত্তিতে তাদের পুরস্কৃত করা হয় তার তালিকা নীচে দেওয়া হল।

ব্রাহ্মণ — ৫০,০০০ টাকা, নায়ার— ৭৫,০০০ টাকা, এজভা— ৫০,০০০ টাকা, তপশিলী জাতি — ৩০,০০০ টাকা।

(২) জনসংখ্যার যুদ্ধ — এক্ষেত্রে লেবাননের দৃষ্টান্ত খুব লক্ষণীয়। ৫০ বছর আগেও লেবানন ছিল খৃস্টান অধ্যুষিত। এর মধ্যে সংখ্যালঘু ছিল মুসলমান এবং ড্রুজ। পরিবার সীমিতকরণের কারণে খৃস্টানরা সেখানে সংখ্যালঘু ও মুসলিমরা সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয় ন'য়ের দশকেই। এর পরিণতি এক দশক ধরে চলছে সেখানে গৃহযুদ্ধ। বিশেষত, এই দেশের সবচেয়ে মনোরম শহর বেইরুট এই যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং মধ্য এশিয়ার এই শহরের মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত। কেরলে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে মুসলিম জনসংখ্যা। গড়ে সারা রাজ্যে বর্তমানে এরা ৩০ শতাংশ, কিন্তু কিছু অঞ্চলে এরা সংখ্যাগুরু। এরা কাশ্মীরের কায়দায় ধর্মান্তর করছে তিনটি উপায়ে। ধর্মান্তরিত হও, নয় পালাও বা মৃত্যুবরণ কর। ইতিমধ্যেই মালাবারের কিছু অংশে হিন্দু মন্দিরগুলির অস্তিত্ব রক্ষাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

(৩) মনস্তাত্ত্বিক পীড়ন— জন্মলগ্ন থেকেই মধ্য এশিয়ায় এই ধর্মটির লক্ষ্য হলো, অন্য ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করা বা তা ধ্বংস করা। তাদের সরল তত্ত্ব হলো, তাদের ইস্ট দেবতাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। উদাহরণ হলো, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এরা মসজিদের সিঁড়ির নীচে কবর দিয়ে হিন্দুদের বোঝাতে চায় যে, লুটেরারা তাদের দেবদেবীকে এইভাবেই পদদলিত করে এবং তা প্রমাণ করে যে, পূর্বোক্ত তত্ত্বই ঠিক। যথেচ্ছভাবে এই লুটেরারা অপহরণ, নারী ধর্ষণের মাধ্যমে সমাজে এক মনস্তাত্ত্বিক পীড়ন শুরু করে। যেসব মানুষ নারীদের ইজ্জত বাঁচাতে পারে না, তাদের বাঁচার অধিকার নেই— এরা দুর্বল।

(৪) যৌন দাসত্ব— সঙ্গিনীর সঙ্গে যথেচ্ছ যৌনাচার এবং সঙ্গিনী প্রতিবাদ করতে পারে না। কারণ অত্যাচারের ভয়ে এরা ভীত। এবং এরাই জেহাদি মন্ত্রে উজ্জীবিত। এইসব যুবকরা নীচু স্তরের, অশিক্ষিত এবং বেকার। এরা যদি মহিলাদের যৌনপীড়ন করে তবে তা তাদের কাছে পুরস্কার স্বরূপ। শুধু ওই তরুণই নয়, তার সাঙ্গপাঙ্গরাও নির্ভয়ে, শাস্তির পরোয়া না করে একজন অসহায় নারীকে ধর্ষণ করে। মহিলাটি যৌনদাসে পরিণত এবং তাকে যৌনপীড়ন মেনে নিতে হয়। এই ধর্ষণ কেবল যৌন সম্ভোগ নয়, বরং তার শক্তি মহিলাটিকে বাধ্য করে তার মতকে স্বীকার করে নিতে।

(৫) আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা— জেহাদি রোমিওরা আর্থিক সহায়তা পায়। উপরন্তু মহিলাদের প্রলুব্ধ করতে প্রায়শঃই এরা গাড়ী, বাইক, সেলফোন ব্যবহার করে। সাধারণত, এদের হাতখরচা হিসেবে শত শত টাকা দেওয়া হয় এবং ফূর্তি করার জন্যও পয়সা বরাদ্দ করা হয়। এইভাবে রোমিও যদি সাফল্য পায়, তবে সে প্রচুর আর্থিক সাহায্য পাবে এবং এইভাবে সে তার এই প্রক্রিয়া চালিয়েই যেতে থাকে। এছাড়া সে তার সাকরেদদের কাছে হিরো হয়ে যায়। কারণ সে এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে যে ওই সাকরেদদের যৌন সম্ভোগের বস্তু। মসজিদে সে বীরের সম্মান পায় এবং তাকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। এইসব কারণেই অধিকাংশ মুসলিম 'লাভ জেহাদ'কে পছন্দ করে। তাদের হারাবার কিছুই নেই, সবটাই লাভ। এইভাবে সে জয়ের মনোভাব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে, ভেবেও দেখে না একজন মহিলার জীবন সে নষ্ট করছে।

এরা একটা লক্ষ্যের দিশারী— তা হল, ইসলামীকরণ। দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ পুরো দুনিয়াটাকেই ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চায় এরা।

একজন নরওয়ের ইমাম মোল্লা কেরকর ওসমোর ২০০৬ সালে কাগজে বলেছে, "লক্ষ্য করুন, ইউরোপের অবস্থা। সেখানে মশককুলের মতো মুসলমানরা বেড়ে যাচ্ছে। ইউরোপে প্রতিটি মহিলা গড়ে ১.৪ জন বাচ্চা দিচ্ছে। প্রতিটি মুসলিম মহিলা উৎপাদন করছে গড়ে ৩.৫টি বাচ্চা। একদিন

লাভ জেহাদের অশুভ প্রভাব সম্পর্কিত এ

আসবে যখন আমরা তোমাদের চেয়ে বেশি শক্তিধর হবো।"

নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা পাকিস্তানে তালিবানদের হাতে সাতমাস বন্দী অবস্থায় থাকার পর লিখেছেন— "এই অঞ্চলে ৭ বছর রিপোর্টিং করার পর আমার মনে হয়েছে যে, মুসলমানরা পুরো বিশ্বে তালিবানদের মাধ্যমে এক মুসলিম দুনিয়া গড়তে তৎপর।"

'লাভ জেহাদ' কি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উচ্চশিক্ষিতা এবং উচ্চশিক্ষারত হিন্দু মেয়েদের নানা কলাকৌশল করে ভালোবাসার জালে আবদ্ধ করা হচ্ছে। তারপর তাদের এমন একটা অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যাতে তারা মুসলমানী বারবধূ হয়ে ইসলামী আত্মঘাতী জঙ্গিতে পরিণত হয়। এরকম ঘটনা ঘটেছে কেরল প্রদেশের বিভিন্ন শহরে। শুধু তাই নয়, আই বি এন-৭ বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন শহরেও এরকম ঘটনা ঘটে চলেছে। কেরলের চার হাজারেরও বেশি হিন্দু মেয়ে এই অতলগহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার পর খুবই সামান্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে কেরলের অ-মুসলিম সমাজ। ইসলামি জেহাদিরা তাদের এই অপারেশনের নাম দিয়েছে 'লাভ জেহাদ'। শিক্ষিত হিন্দু মেয়েদের জীবন-যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পর জেহাদিরা তাদের ভারতবিরোধী তথা হিন্দুবিরোধী আত্মঘাতী জঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করছে। মামলা হয়েছে কেরল হাইকোর্টে। কোর্ট তার রায়ে এই 'লাভ-জেহাদ'কে বাস্তব এবং রাষ্ট্রবিরোধী ভয়ঙ্কর প্রবণতা বলে মন্তব্য করেছে।

লাভ জেহাদ হিন্দুস্থানকে ইসলামীস্তানে পরিণত করার ষড়যন্ত্র

অশুভ প্রভাব সম্পর্কিত একটি পোস্টার।

এন সি দে

ইসলামী আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদের আর একটি নমুনা হলো এই প্রেম-জিহাদ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত অসহিষ্ণুতার এক চরম বহিঃপ্রকাশ এই প্রেম-জিহাদ। প্রতিটি হিন্দু বিশ্বাস করে, প্রেম হলো মানব-মানবীর জীবনের নৈসর্গিক অধ্যায়। সেই কারণে কবিগুরু বলেছিলেন, ''আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি অনাদিকালের অসীম উৎস হতে''। এবং ''তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'' হিন্দু জীবনপদ্ধতিতে প্রেম তাই দুটি আত্মার মিলন। অতএব ঈশ্বরের লীলার অঙ্গ। মোল্লাতন্ত্রের পাতা ফাঁদ নয়, হৃদয়হীন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নয়, কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির কলাকৌশল নয়।

হিন্দু নর-নারীর মধ্যে প্রেম সম্পর্কিত এই ঐশ্বরিক পবিত্র ধ্যান ধারণাকেই পুঁজি করে একদল ধর্মীয় উন্মাদ কোমলমতি হিন্দু নারীকে প্রেমের জালে আবদ্ধ করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর করছে এবং এর ফলে হিন্দুর সংখ্যা যেমন কমছে, অপরদিকে এই ধর্মান্তরিত হিন্দু নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে মুসলমান তৈরির অবিরাম যন্ত্র হিসাবে।

এইসব তথ্যই উঠে এসেছে কেরলের উচ্চ আদালতের বিচারপতি কে টি শঙ্করণের এক ঐতিহাসিক রায়ে। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন, প্রেমের নামে এ হচ্ছে হিন্দু ও খৃস্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক ধরনের ধর্মীয় জিহাদ, যার নাম 'লাভ জিহাদ' বা 'প্রেম-জিহাদ'। তাঁর মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা আসে শিক্ষা লাভ করতে। ওই পবিত্র স্থানগুলি ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্র নয়। কিন্তু প্রেম জিহাদের আসল উদ্দেশ্য হলো প্রেমের ছলে হিন্দু-খৃস্টান বা অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিয়ে করে তাদের ইসলামে ধর্মান্তর করা। গত ৯ ডিসেম্বর মাননীয় বিচারপতি এই রায়ে প্রেম ও রোম্যান্সের আড়ালে ধর্মান্তর বন্ধ করা জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কড়া আইন তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে প্রেম জিহাদ সম্পর্কে বিশদ খোঁজ নিতে নির্দেশও দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কেরলের সাথানমথিটা অঞ্চলের সেন্ট যোশেফ কলেজের এম বি এ পাঠরত দুই ছাত্রীর বাবা-মা ওই কলেজের দুই সিনিয়র ছাত্র শাহনসা ও সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে তাদের মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাদের ইসলামে ধর্মান্তর করার অভিযোগ দায়ের করেন। ছাত্রীদের অভিভাবকদের অভিযোগ যে, তাদের মেয়েদের চমকদার গাড়ী, মূল্যবান ঘড়ি, শাড়ী-আংটি উপহার, শহরের দামী রেস্টুরেন্টে খাওয়ানো ইত্যাদি দিয়ে আকৃষ্ট করে ওই দুই ছাত্র প্রেমের খেলা করে। একদিন মেয়ে দুটিকে তাদের পরিবার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাধ্য করা হয় এবং পরে তাদের কেরলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মল্লাপুরম জেলার পোন্নানিতে নিয়ে গিয়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। মেয়ে দুটির অভিভাবকদের দায়ের করা হেবিয়াস করপাস আবেদনের ফলে পুলিশ উপরোক্ত দুই জিহাদি রোমিওকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে। আদালত এই দুই জিহাদির জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। মেয়ে দুটিকে জিহাদিদের কব্জা থেকে উদ্ধার করে তাদের বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এইরকম অসংখ্য কেস কেরল হাইকোর্টে অনেকদিন ধরেই পেশ করা হচ্ছে। কিন্তু উপরোক্ত দুই ছাত্রীর একজনের বাবা পদস্থ পুলিশ অফিসার হওয়াতেই 'লাভ জিহাদ' বা 'প্রেম জিহাদ' বিষয়টি আর চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। খবরের কাগজ ও টিভি চ্যানেলগুলিতে এই বিষয়ে লেখালেখি ও আলোচনা শুরু হয়েছে। খৃস্টানদের রবিবাসরীয় সম্মেলনে বিশপগণ 'লাভ জিহাদ'-এর ফাঁদে যাতে তাদের সন্তান-সন্ততিরা না পড়ে তার জন্য নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনদের বোঝাচ্ছেন। হিন্দু ঐক্য বেদী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলিও এই সমস্যার মোকাবিলায় তৎপর হয়েছে। কেরলের কলেজগুলির সামনে 'লাভ জিহাদ'-এর সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে পোস্টার দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি ও সংগঠন এই বিষয়ে তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। সেই সমস্ত গবেষণপত্রে প্রকাশিত তথ্য থেকে আজ পর্যন্ত যা জানা গেছে তা এক কথায় ভয়াবহ।

> ***বাইরে থেকে অনুপ্রবেশ এবং ভিতর থেকে 'লাভ জিহাদ'-এর মাধ্যমে মুসলিম জিহাদিদের একটিই উদ্দেশ্য— হিন্দুস্থানকে ইসলামিস্তানে পরিণত করা। ঠিক যেমনটি আশঙ্কা করেছেন নেদারল্যাণ্ডের সাংসদ গ্রেট উইল্ডার। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভাষণে তিনি বলেছেন, "ইসলাম সর্বদা চেষ্টা করেছে ইউরোপকে জয় করতে। স্পেন জয় করেছে অষ্টম শতাব্দীতে। ভিয়েনা ও পোল্যাণ্ড সন্ত্রস্ত। এবং আজ একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম পুনরায় সক্রিয়। এবার আর সামরিক বাহিনী দিয়ে নয়, তারা জয় করতে চায় অনুপ্রবেশ আর জনসংখ্যা বাড়িয়ে।"***

'লাভ জিহাদ' হলো কেরলের মুসলিম আতঙ্কবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত উগ্রপন্থী যুবকদের একটি গোষ্ঠী। এদের কাজ হলো হিন্দু, খৃস্টান এবং অন্যান্য অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের তরুণী মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা এবং পরে ওইসব মেয়েদের দিয়ে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ করানো। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রীদের সঙ্গে রোমিও সেজে ঘোরাফেরা, প্রেমালাপ, রেস্টুরেন্ট, পাব বা রিসর্টগুলিতে ফূর্তি ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়া। জন্মদিনে ভালো দামী উপহার দেওয়া বা দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কখনও কখনও আর্থিক সাহায্য দিয়ে পরিবারের মধ্যে ঢুকে পড়ছে এরা। দালাল সংবাদপত্রগুলি মুসলমান যুবকদের এহেন কাজকে এমনভাবে তুলে ধরছে যেন এরা মানবপ্রেমী। এই সুযোগে এরা কখনও মোবাইল, টেপ, স্কুটার ইত্যাদি দিয়ে তাদের আকর্ষিত করছে। ঘনিষ্ঠতার পর যখন ঘরবাঁধার স্বপ্ন দেখে মেয়েটি, তখন প্রেমিকাটি তাকে নিয়ে যায় কোনও মৌলবীর কাছে। সেখানে তাকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।

এরপর শুরু হয় তার আজন্মলালিত দৈহিক, মানসিক শুদ্ধতা হরণের প্রক্রিয়া। সাহায্য নেওয়া হয় ইন্টারনেটের পূর্ব পরিকল্পিত ওয়েবসাইটগুলোর। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেমন সুন্দরী হিন্দু নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক করা যায়, ঠিক তেমনিভাবে এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্লু-ফিল্ম দেখিয়ে তাদের উত্তেজিত করে যথেচ্ছ যৌনাচারে মত্ত করা হয় এবং সেই দৃশ্যগুলো ক্যামেরাবন্দী করে তাদের ব্ল্যাকমেল করার পথ প্রশস্ত হয়। মেয়েটিকে দৈহিকভাবে অশুদ্ধ অথবা সন্তানসম্ভবা করিয়ে তাকে পুরোপুরি মুসলিম প্রেমিকের প্রতি নির্ভরশীল করে তোলা হয়। পরে চলে ইসলাম সম্পর্কে ব্রেইনওয়াশ। স্বেচ্ছায় সফল হলে ভালো না হলে নির্যাতনের মাধ্যমে বাধ্য করা হয় ইসলামী জিহাদি কার্যকলাপে নামতে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, এইসব ধর্মান্তরিত হিন্দু মেয়েদের দিয়ে অন্য হিন্দু মেয়ে বা পুরুষদের প্রলুব্ধ করা হয়েছে। যেমন পোষা হাতি দিয়ে প্রকৃতির মাঝে লালিত সরল হাতিদের ফাঁদে ফেলা হয়। এইসমস্ত কার্যকলাপের পিছনে রয়েছে সংগঠিত প্যান ইসলামিক মস্তিষ্কপ্রসূত নানান রঙের, নানান নামধারী মুসলিম সংগঠন। যেমন রয়েছে সিমি, ক্যাম্পাস ফ্রন্ট, পপুলার ফ্রন্ট প্রভৃতি সংগঠন। এদের কাজ মুসলিম প্রেমিকদের কাজে সাহায্য করা ও তাদের রক্ষা করা। মুসলিম ইয়ুথ ফোরাম, এন ডি এফ এবং তসরিন মিল্লাদ ও শাহীম ফোর্স-এর মতো মুসলিম মহিলা সংগঠন। এদের কাজ সক্রিয় লাভ জিহাদ চালানো। 'স্মার্ট ফ্রন্ট' নামে একটি মুসলিম সংগঠন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চবংশীয় মেধাবী হিন্দু ও খৃস্টান মেয়েদের ফুসলানোর কাজে রয়েছে সক্রিয়। এদের কাজের ক্ষেত্র মূলত আই টি সেক্টরের মতো পেশাদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। আর উপরোক্ত সংগঠনগুলোকে অঢেল অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এবং বিদেশের মুসলিম দেশগুলো। অতএব এ এক সংগঠিত অপরাধ চক্র।

নৃশংস দৈহিক ও মানসিক যৌন নিগ্রহের ফলে বেশিরভাগ নিজ সমাজচ্যুত হিন্দু নারী 'স্টকহোম সিনড্রোমের' শিকারে পরিণত হচ্ছে। মোহের বশবর্তী হয়ে পুরুষের হাত ধরে নিজ সমাজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন নারী যখন পুরুষটির হাতে সহস্র নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়, অথচ নিজ সমাজে ফেরার উপায় থাকে না, তখন সে আত্মসম্মানহীন এক জড় মানবে পরিণত হয়, মনুষ্যেতর জীবে পরিণত হয়। সেই অবস্থায় তাকে দিয়ে সমস্ত অপকর্ম করানো যায়। কারণ সে তখন তার প্রেমিকের একটু পিঠ চাপড়ানোতেই বর্তে যায়। একেই বলে স্টকহোম সিনড্রোম। এইরকম শিক্ষিত, আকর্ষণীয় চেহারার সুন্দরী হিন্দু মেয়েদের দিয়ে অন্য মেয়ে ও পুরুষদের ফাঁদে ফেলার কাজ করানোর অনেক ঘটনার সন্ধান মিলেছে। পরেশ পিল্লাই নামে এক হিন্দু পুরুষ সাজিদা নামে এক সুন্দরীর পাল্লায় পড়ে মুসলিম ধর্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পরে তার নাম হয় জাভেদ। সাজিদা নামের মেয়েটিও ছিল এক ধর্মান্তরিত হিন্দু নারী। নিজেরা পতিতা হয়ে এরা অন্য নারীদের পতিতা বানিয়ে আনন্দ পায়। বোরখার আড়ালে এইসব হিন্দু নারীরা অনেক হিন্দু তরুণী পাচারে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। হিন্দু জীবনশৈলীর এ এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। আর যারা ইসলামী উগ্রবাদকে মেনে নিতে পারেনি, তাদের কপালে জুটেছে বেশ্যালয় কিংবা মধ্য এশিয়ার কোনও যৌন বিকারগ্রস্থের হারেমের যৌনাগার। কোজিকোড এবং কোচিতে হানা দিয়ে এরকম বহু ধর্মান্তরিত হিন্দুনারীর সন্ধান মিলেছে। অনেককে আবার ম্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর ও মুম্বাইয়ে পতিতালয়ে পাচার করা হয়েছে। আরও অনেককে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে কিংবা প্রমোদ তরণী ভ্রমণে প্রলুব্ধ করে সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজে তুলে

(এরপর ১৩ পাতায়)

...াদ' কিছু সতর্কতা

এখন সময়ের আহ্বান হলো, দেশ ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এই শিক্ষিত মেয়েদের (অশিক্ষিতদের কথা যদি বাদও দেওয়া হয়) 'লাভ জেহাদ'-এর ফাঁদেপড়া আটকাতে বাড়ির অভিভাবকদের কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন—

মা-বাবাকেই, বিশেষত মাকে মেয়ের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এই ভয়াবহ ভালোবাসার নামে আত্মঘাতী খেলা থেকে বিরত করতে হবে। দেখতে হবে মেয়ের মোবাইলে কোনও ছেলে বন্ধু কতক্ষণ কথা বলেছে বা মেয়ের মোবাইলের বিল বেশি কেন হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতেও যেন 'মা' পিছপা না হন।

হঠাৎ করে মেয়ের চালচলনে যদি পরিবর্তন দেখা যায়, তাহলে খোঁজখবর নিতে হবে। যদি সে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মঠ-মন্দিরে যেতে অপছন্দ করে, আবার ইসলাম বা খৃস্টানদের ধর্মীয় বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু বা আবেগপ্রবণ হয়।

মেয়ের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা বা বাইরে বেড়াতে যাওয়া, বাইরে ২-৪ দিন কাটালে তা যথেষ্ট সন্দেহজনক।

(এরপর ১৩ পাতায়)

পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের স্রষ্টা

খুন, সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই পরমত, জনমত, মানবতাবাদকে দাবিয়ে রাখাটা আজ কম্যুনিস্ট সংস্কৃতিরই অঙ্গ। এ ব্যাপারে লেনিন, মাও, কাস্ত্রো, হো-চি-মিন সকলে একই পথের পথিক। দল এবং দলের বাইরে সবরকম বিরুদ্ধ তার সামনেই নৃশংস নরঘাতকের রূপ ধারণ করেছে বিশ্বের সকল কম্যুনিস্ট শাসকরা। কিন্তু জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে ক ম্যুনিস্ট দের আদর্শগত অমিল আছে। কম্যুনিস্টরা নিষ্ঠুরভাবে নিশ্চি হ্ন করেছে বিরোধী পক্ষকে। মানবিকতার ছোঁয়া কমিউনিস্ট শাসনে থাকে না। তত্ত্বগতভাবে যাঁরা মানুষকে অর্থনৈতিক জীব হিসাবে দেখে তাঁদের কাছে মানবিকতা আশা করাও উচিৎ নয়। বর্তমানে মার্কসবাদ, মাওবাদ যে পথেই চলুক না কেন, পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের স্রষ্টা সিপিএম। সন্ত্রাস, মানবাধিকার লঙঘনে অগ্রসর সিপিএম নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট দল। খবরে প্রকাশ, সিপিএমের হাতেও অস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে। কেবলমাত্র, শাসকদলের মার্কসবাদীরা প্রশাসনের সাহায্য পায়। তবে রাজ্য প্রশাসন ও সিপিএম দলের ভেতর মাওবাদীদের সমর্থক অনেক আছে। সম্প্রতি সাঁকরাইল থানার ওসি অপহরণকে কেন্দ্র করে কিছু সিপিএম নেতার বক্তব্যেই সেটা প্রমাণিত। পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিতভাবে রাজনৈতিক হত্যা শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। যাঁর নেতৃত্বে ছিল মার্কসবাদীরাই। কংগ্রেস দল তখন খণ্ডিত হয়। তখন অজয় মুখার্জী বাংলা কংগ্রেস গঠন করেন। প্রণব মুখার্জীও বাংলা কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দেন। বামেদের সঙ্গে জোট করে অজয় মুখার্জীর হাত ধরে রাজ্যে গঠিত হয় প্রথম অকংগ্রেসী সরকার। সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন অজয় মুখার্জী। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব হাতে নেন উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। অজয় মুখার্জীকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিয়ে পুলিশ ও ক্যাডারের সাহায্যে রাজ্যে বিরুদ্ধ পক্ষকে নিশ্চি হ্ন করার পরিকল্পনা নেয় সিপিএম। বর্ধমানের সাঁইবাড়ী ও পুরুলিয়ার আনন্দনগরে নৃশংসভাবে খুন তথা গণহত্যা করে কমিউনিস্টরা। আনন্দনগরে ৫ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী খুন হয়। এই সময় বর্বরোচিত ঘটনাটি ঘটেছিল বর্ধমানের সাঁইবাড়ীতে। সেখানে ছেলেকে খুন করে তাঁর রক্ত মায়ের মুখে লাগিয়ে দিয়েছিল সিপিএমের ঘাতকবাহিনী। কিন্তু কংগ্রেসীদের অকর্মণ্যতার জন্যে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত রাজ্যে ক্ষমতায় থেকেও সাঁইবাড়ী হত্যার আসামীদের বিচারের ব্যবস্থা করতে পারেনি। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেই ওই মামলা প্রত্যাহার করে। বর্তমান রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরূপম সেন, বিনয় কোঙার প্রমুখ এই হত্যা মামলার আসামী ছিলেন। এই হত্যা মামলার আর এক নেতা মানিক রায়, ছদ্মবেশে আরামবাগের সিপিএম নেতা অনিল বসু বলে সংবাদে প্রকাশ।

যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যে বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬৭ সালেই কম্যুনিস্ট পার্টিতে দ্বিতীয়বার বিভাজন ঘটে। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রথম বিভাজন ঘটে চীনাপন্থী ও রাশিয়ানপন্থীদের অভ্যন্তরে। মূল সিপিআই থেকে যায় রাশিয়াপন্থী হয়ে। চীনাপন্থী হয়ে যায় সিপিআইএম। ১৯৬৭ সনে সিপিআইএমের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিভাজন ঘটে। মূলত সন্ত্রাস সৃষ্টির কৌশল নিয়ে উভয়ের বিরোধের ফলে। জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তরা চেয়েছিলেন রাজ্যে ক্ষমতায় থেকে ধীরে ধীরে সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে নিশ্চি হ্ন করা। অপরপক্ষে অন্য এক দল চেয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। এই গোষ্ঠী চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সিপিএমে বিভাজন ঘটিয়ে রাজ্যে তৈরী করে পৃথক দল সিপিআই (এম এল)—এরাই নকশাল নামে পরিচিত হয়। ১৯৬৭ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যে খুন, সন্ত্রাস, অরাজকতা চলেছিল, তাঁর মূলে ছিল সিপিআই(এম) ও সিপিআই(এম এল) এর মধ্যে সংঘর্ষ। ১৯৭২ সনে সিদ্ধার্থশংকর রায় ক্ষমতায় এসে সিপিএমের সাহায্যে নির্মমভাবে নকশাল আন্দোলন দমন করেন। এরপর ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে প্রফুল্ল সেনের ভুল চালে। পুলিশ, প্রশাসন সর্বস্তরে জঙ্গি ক্যাডার ঢুকিয়ে রাজ্যে ধীরে ধীরে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরির কাজ শুরু হয়। ২০০৪ সনে এই পি ডব্লিউ জি সহ কয়েকটি দল মিলে তৈরি হয় সিপিআই(মাওবাদী)। অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশার কিছু অঞ্চ লে এরা সক্রিয় ছিল। এরপর ধীরে ধীরে ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। নেপালের মাওবাদীদের সঙ্গে সীতারাম ইয়েচুরির সখ্যতা গোপন নয়। মাওবাদী মার্কসবাদী উভয়েই চীনপন্থী। রাষ্ট্রক্ষমতার জোরে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে মাওবাদী মার্কসবাদীরাই এগিয়ে।

গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস, ভাদুরিয়া (ঠাকুরনগর) উঃ ২৪ পরগণা

গান্ধী পদবির মাহাত্ম্য

আমাদের দেশে জওহরলাল নেহরু এবং ফিরোজ খানের স্ত্রী ও পুত্র শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর নামে যে পরিমাণ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সৌধের নামকরণ করা হয়েছে, তার সংখ্যাটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। প্রায় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই তিন ব্যক্তির নামে। এছাড়া বিভিন্ন ভবন, বিমানবন্দর, বন্দর, স্টেডিয়ামসহ কয়েক হাজার জাতীয় সম্পত্তি এই তিনজনের নাম বহন করে চলেছে। ভারতের ইতিহাসে এদের অবদানের জন্যই যে এত নামকরণ হয়নি তা সহজেই অনুমেয়। কারণ, তাহলে ক্ষুদিরাম, রাসবিহারী, ভগৎ সিং, রাজগুরু, বিনয়-বাদল-দীনেশ, বাঘাযতীন, মঙ্গল পাণ্ডে প্রমুখেরা এতটা বিস্মৃতির আড়ালে থাকতেন না। সর্বোপরি বীর সাভারকর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামেও কয়েকশ' প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সরকারি সুলভ শৌচাগার ও শ্মশানক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্রই ভুয়ো গান্ধীদের নামের ছড়াছড়ি। কংগ্রেসের এই নোংরামির সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবে চালু হয়েছে আরেকটি ঘৃণ্য চক্রান্ত। বর্তমানে চালু ডাকটিকিট বিক্রি করা হচ্ছে ডাকঘর থেকে। সুপরিকল্পিত ভাবে পূর্বের ডাকটিকিট ছাপানো হচ্ছে না। বাধ্য করা হচ্ছে ইন্দিরা ও রাজীবের ছবির ডাকটিকিট কিনতে। এই চক্রান্ত অবিলম্বে বন্ধ হোক।

—রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান।

বঙ্গ-সংস্কৃতি

সুদীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে বাংলায় একটা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে তা যুগান্তকারী হবে নিঃসন্দেহে এবং তা ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র এশিয়াতেও বলা যায়। কেননা, এর প্রভাব ভারতবর্ষের বৈদেশিক তথা শক্তিসাম্য নীতিকেও প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু এই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও সর্বোপরি ধর্মীয় জীবনে বাঞ্ছিত কিনা তা ভাবীকালই বলে দেবে, বাংলার ললাট লিখন কি!

ওপার বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটায় অনেকটা সংস্কারমুখী হতে সচেষ্ট হচ্ছে সে দেশের সরকার। হয়তো সংবিধানের অবয়বও বদলে যেতে পারে সরকারের অনমনীয় মনোভাব বজায় থাকলে। ফলত সেখানে একটা পশ্চিমী আরবী ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীত্বের সংঘাত রাজনৈতিক ভাবে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এখন যদি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ন্যায় বাঙালীত্বের তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদের জয়ধ্বনি শোনা যায়, তবে তা সোনার বাংলার জন্য শুভকর।

অপরদিকে, এপার বাংলাতেও যে পরিবর্তনের ঝড় উঠেছে, তাতে বাঙালীত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা সময় এসেছে বলা যায়। এ বাঙালী সংস্কৃতি ও চেতনাকে একটা পশ্চিমী আরবী ধর্মীয় সংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য যারা সর্বাপেক্ষা বেশী অবদান যুগিয়েছিলেন, তারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও মার্ক্সীয় দর্শনের কুয়াশায় বিস্মৃতপ্রায়। বর্তমান ক্যুইজসর্বস্ব বাঙালী যুব সমাজ তা জানেই না বলে মনে হয়। বাংলা ভাগের ফলস্বরূপ উদ্বাস্তু দল জান-মান রক্ষার তাগিদে এ বাংলাতেই হাজির হয়ে শান্তির নীড় বানায়। কিন্তু দিল্লীর কংগ্রেসের আসন সংখ্যাতত্ত্বের জন্য একটা তত্ত্ব (মার্কসীয়) বাঙালীর একান্ত নিজস্ব জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতির সমূলে দীর্ঘ ৩৩ বছর যাবৎ কুঠারাঘাত করে চলেছে। আজ যে পরিবর্তনের সুর বাতাসে বাজছে, তা পারমাণবিক চুক্তি (সম্ভাব্য) উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের কংগ্রেস সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার ও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনের জন্যই বলা যায়। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক শাসক দলের থেকে সরে আসতেই পরিবর্তনের ঝড় ব্যাপক হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেও চোরাস্রোতের ন্যায় বাঙালী সংস্কৃতিকে পুনরায় গ্রাস করার জন্য কি সেই বিদেশী অতি লাল তত্ত্ব ও পাকিস্তান তথা পূর্বতন পশ্চিম পাকিস্তানের হাত ঘুরে আরব ধর্মীয় উগ্র সংস্কৃতির প্রবাহ বইছেনা কিংবা বইবে না? সমাজের একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে খুশি ও তুষ্ট করার নীতির পরিণাম কি কোনও উত্তরের মলিন বাতাসের কোমল পরশ নিয়ে আসবে? একথা ভুললে চলবে না যে, বাংলা তথা দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু স্রোতকে ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যই আশ্রয় দেয়নি, আবার বাংলার ন্যায় বাঙালীর জন্য আর একটা দুটো রাজ্য তৈরির সম্ভাবনা বর্তমান শাসকগোষ্ঠী অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছে। বর্তমানে প্রশাসনের নির্লিপ্ততায় রাজ্যে যে ভাঙনের গান চলছে তা কি বাঙালী সংস্কৃতিকে দীপান্তরে পাঠানোর জন্য নয়? সেইজন্য এখনই সময় এসেছে বাংলা ও বাঙালীর ভবিষ্যতের জন্য অতীতের কথা বেশি বেশি করে বলার, নয়তো এই ঘুমন্ত জাতিকে নবজাগ্রত করবে কে?

যদি ২০১১ সালে পরিবর্তন হয়ও, সে ক্ষেত্রে ওপার বাংলার মহিলা নেত্রী যে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে সচেষ্ট হচ্ছেন, এপার বাংলাতেও তা হবে তো? এমনিতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভাঙনের গান গাইবার মঞ্চ প্রস্তুত করে রাখা হচ্ছে সরকারি সৌজন্যতায়, কেবল সেই হাওয়া উঠলেই নৌকার পাল তুলে বসে ২০১৬তে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য। যদি তাই ঘটে, তবে বাঙালী ও তার সংস্কৃতির অন্তর্জলির যাত্রা ঘটবে অনুমান করাই যায়। তাই এই সন্ধিক্ষণে কেবল ডোডো পাখী না হয়ে থেকে, বাংলা ও বাঙালীর ভবিষ্যতের জন্য নবজাগরণের মূল মন্ত্রগুলি ও গত শতাব্দীর তিন ও চারের দশক থেকে বাংলার রাজনীতিক ধারাগুলি বলার জন্য অতীতকেই কথা বলতে বলি— হে অতীত, কথা কও।

— শিবাশীষ রায়চৌধুরী, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি— কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

হৃষীকেশ কর

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মনে হয় ২০০৯ সালে জনগণের কাছে এক দুঃস্বপ্নের বছর। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, কী কেন্দ্রীয় সরকার, কী পশ্চিমবঙ্গ সরকার— এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। পরন্তু, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শরদ পাওয়ার সম্প্রতি বলেছেন, চিনির দাম আরও বাড়বে। এই কথা বলার পর চিনির দাম প্রায় ৫০ টাকা ছুঁয়েছে। কত নির্লজ্জ হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই ধরনের উক্তি করতে পারে ও কেন্দ্রীয় সরকার চুপ থাকতে পারে তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। প্রসঙ্গত, শরদ পাওয়ার মহারাষ্ট্রের বিরাট চিনি লবির ওপর বিশেষ প্রভাব রাখেন। লক্ষণীয়, কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী এতদিন কোনও খোঁজখবর রাখেননি। দেশে চিনির মজুত কত, কম থাকলে বিদেশ থেকে আমদানি করা দরকার, বাজারে যোগান দেওয়া দরকার — এসব চিন্তা মাথায় আসেনি। এলেও তা বাজারে কত দেরিতে পৌঁছায় তারই চেষ্টা করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে দেখলাম, দশ লক্ষ টন অপরিশোধিত চিনি বন্দরে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। তা পরিশোধিত করে বাজারজাত করার কোনও চেষ্টাই হয়নি। বাজারে চিনির দাম বাড়াতে সাহায্য করেছে কংগ্রেস সরকার। খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের জরুরি বৈঠকে ডেকেছেন। এদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতজুড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। কিন্তু শরদ পাওয়ারের আচরণ দেখে মনে হয়, চিনির দাম বাড়া-কমার সুইচ কন্ট্রোল তাঁর হাতেই রয়েছে।

চিনিসহ অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ রয়েছে অন্যত্র। কাগজে দেখেছি, গত লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস জেতার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়েছে। এখন ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্টির জন্য তাদের জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর সুযোগ দিচ্ছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও পিছিয়ে নেই।

জনমত

আলুর দাম বাইশ টাকায় উঠেছিল। কোল্ড স্টোরেজ থেকে জবরদস্তি সরকার আলু বের করতে গেলে মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ প্রবল হুমকি দিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত পাঞ্জাব থেকে আলু কিনে সারা রাজ্যে গুটিকয়েক দোকান থেকে তা বিক্রির নাটক করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসও কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ থাকায় এক সপ্তাহ আগেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলনের চিন্তা করেনি। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সি পি আই এমের বহু নেতার আলুর বন্ড কেনা থাকায়, তাদের লাভের জন্য ওই সমস্ত দল কোল্ড স্টোর থেকে আলু জবরদস্তি বের করার কোনও আন্দোলন করেনি। সংশ্লিষ্ট সারণিতে সাধারণ লোকের প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম গত বছর ১ জানুয়ারি থেকে এপর্যন্ত কত বেড়েছে তার উল্লেখ করলাম। তার থেকে বুঝতে পারবেন যে, গত লোকসভার ভোটের পর জিনিসপত্রের দাম কিভাবে বেড়েছে। এর থেকে বুঝতে পারবেন, লোকসভা ভোটের সঙ্গে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।

এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন ভারতছাড়ো আন্দোলনের জন্য বাঙালীদের শায়েস্তা করতে বিদেশী সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রুখতে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এখন দেশীয় কংগ্রেস সরকার ও বামফ্রন্ট সরকার ব্যবসায়ীদের ও দলীয় নেতাদের পকেটভারী করতে জনসাধারণের সঙ্গে বেইমানী করেছে। সরকারি, আধা-সরকারি, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ছয়মাসে মূল্যবৃদ্ধি ভাতা বাড়ছে, সাধারণ লোকের প্রতি সরকার উদাসীন।

তাই আপনাদের কাছে আবেদন, আওয়াজ তুলুন, 'সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রুখুন, নতুবা গদি ছাড়ুন।' ভবিষ্যতেও এদের উচিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

সারণি

দ্রব্য	১.১.০৯	১.৩.০৯	১.৬.০৯	১.৯.০৯	১.১২.০৯	১৪.১.১০	বেড়েছে শতকরা
চাল	২০	২০	২১	২১	২৩	২৫	২৫
চিনি	২১	২৪	২৫	৩১	৪০	৫০	১৫
আলু	৪	৬	১৫	১৮	২২	৭	৪৫
আটা	১৬	১৭	১৮	২২	২৩	২৩	৫০
মুগডাল	৫০	৫০	৫৮	৬৪	১১০	১৩০	১৬০
মুসুরডাল	৪৫	৬৮	৬২	৬৪	৬৫	৭০	৫৫.৫৫

পরম্পরা

কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ

বিজয় আঢ্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা লিখতে গিয়ে ঠাকুরেরই একটা কথা মনে পড়লো। ঠাকুর বলেছিলেন—নুনের পুতুলরা একবার সমুদ্রের জল মাপতে গিয়েছিল। একটু নেমেই গলে গেল। তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর। তাই ভাবছি কী লিখবো?

শোভাবাজার পার্কের কাছ থেকে বত্রিশ নম্বর বাস ধরে মা-ঠাকুমার সঙ্গে সেই ছোটবেলা থেকেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করছি। মন্দির চত্বরের উত্তর পশ্চিম কোণের সেই ঘরে—যে ঘর ঠাকুরের লীলাধন্য, সেখানেও গিয়েছি। কিন্তু সেই বালক বয়সে দ্বাদশ শিব মন্দিরের পেছন থেকে গঙ্গা দেখা, ব্রিজের উপর দিয়ে ঝমঝম করে রেলগাড়ি যাওয়া, পঞ্চ বটির বাগানে বাঁদরের দল—এসবই ছিল মুখ্য আকর্ষণ।

সেসময় ঠাকুর নয়, বরং স্বামীজীর গল্পই, যেমন ধ্যান-ধ্যান খেলা, ভিখিরিকে কাপড় দিয়ে দেওয়া, বাগানে ব্রহ্মদৈত্যকে দেখতে যাওয়া এসব শুনেছি। বিশেষত যে হিন্দু সংগঠনটির সঙ্গে আবাল্য যুক্ত, তার অন্যতম প্রেরণার পাথেয় স্বামীজী। কর্মজীবনের সূচনা পর্বে এমন একজনের সান্নিধ্যে আসি, যাঁকে দেখে ঠাকুর-মা সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করি। আর এই পর্বে কর্মস্থল ছিল কামারপুকুর জয়রামবাটী সংলগ্ন এলাকা। তাই নিত্যদর্শন সম্ভব না হলেও নৈমিত্তিক দর্শন তো ছিলই। তবে এটাও বলে রাখা ভালো, পুকুরে পদ্মের কাছে-পিঠে থাকলেও ব্যাঙ ব্যাঙই থাকে, পদ্মের মধুর স্বাদ গ্রহণের জন্য ভ্রমর হতে হয়। ঠাকুরের অত কাছে থেকেও ভাগনে হৃদে পরবর্তীকালে হৃদয়ানন্দ হয়ে উঠতে পারেননি। অথচ সেবক লাটুর উত্তরণ ঘটেছিল স্বামী অদ্ভুতানন্দ-এ। ঠাকুরের কৃপাই এর মূলে।

আমেরিকাতে একজন স্বামীজীকে বলেছিলেন, আপনি যদি ওই মধ্যযুগীয় পুরোহিতটির পাল্লায় না পড়তেন, তাহলে আরও বড় হতেন। তুষের ভেতর যে আগুন থাকে লোকটার বোধহয় তা জানা ছিল না। স্বামীজীর সেই রুদ্র মূর্তি দেখে সে যেন পালাতে পারলে বাঁচে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ তৈরি হয়।' কৃপার স্বরূপ সম্বন্ধে ঠাকুর নিজেই বলেছেন, হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শন লাভ হয়।

ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা আমরা সাধারণ মানুষরাও পেয়েছি। কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে জীবনের অন্তিমলগ্নে ঠাকুর 'কল্পতরু' হয়েছিলেন। অর্থাৎ যে যা চাইবে তাকেই তিনি সেই কৃপা করবেন। কিন্তু কাউকে চাইতে পর্যন্ত হয়নি, তিনি নিজেই এমন কৃপা করলেন, ইতিপূর্বে তা কেউ কখনও শোনেনি। ঠাকুর বললেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' এর থেকে বড় কৃপা আর কী হতে পারে? এইতো সব শেষের কথা—সব সাধনার নির্যাস। দেহসুখ, টাকা, লোকমান্যি-র বেড়া ভাঙা যদিও বা কারোও পক্ষে সম্ভব হয়, কিন্তু 'আমি'-র বেড়াটা যে ভাঙাই যায় না। এখানেও ঠাকুর কৃপাসিন্ধু। ঠাকুর আশ্বস্ত করে বলেছেন, শরীর থাকতে আমার 'আমিত্ব' একেবারে যায় না। যেমন নারিকেল গাছের বাল্‌তো খসে যায়, কিন্তু দাগ থাকে। যেমন, কায়া থাকলে ছায়া থাকবেই। তবে সূয্যিমামা একেবারে মাথার উপরে থাকলে যেমন ছায়াটা আর দেখা যায় না, সেরকম আর কী।

।। শ্রীশ্রী ঠাকুরের ১৭৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত।।

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে ঠাকুর চিৎকার করে ডাকতেন—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আয়। ঠাকুর বলতেন, সেসময় তাঁর বুকটা কে যেন গামছা নিংড়ানোর মতো নিংড়াতো। ঠাকুরের এই ডাক শোনার পরই একে একে উপস্থিত হয়েছিল রাখাল, নরেন, বাবুরাম, তারক, শরৎ, শশী, গঙ্গাধর-রা। ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বর লাভই জীবনের লক্ষ্য। যো সো করে একবার সেখানে পৌঁছে যা। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে থাকার যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল, রাতের শেষ প্রহরেই তিনি তাঁদের জাগিয়ে দিতেন। বলতেন, ওরে, ওঠ ওঠ। কখন তাঁর নাম করবি? সময় যে চলে যায়। বলতেন, খোটাতে গরু বাধা আছে ঠিক কথা। কিন্তু যতটা দড়ি লম্বা, ততটা তো খোটার চারদিকে ঘুরে খেতে পারবে। এই চেষ্টাটাই হল 'যো-সো'—সাধনা, তপস্যা। দেখছি এতো কৃপার পরেও ঠাকুর আলস্যতাকে একেবারে প্রশ্রয় দেননি।

সাধনার একটা খুব সরল সূত্র দিয়েছেন ঠাকুর। যেভাবেই চলি না কেন, এই সূত্রটার কোনও জবাব নেই। ঠাকুর বলেছেন, 'মন মুখ এক করাই সাধন।' অর্থাৎ মুখে যা বলছি মনে তা ভাবছি, আর মনে যা ভাবছি, মুখে তা বলছি। এটা যে খুব একটা কঠিন কাজ অন্তত প্রথমে শুনে তা মনে হয় না। আমাদের মধ্যে অনেকেই তো ঠোঁটকাটা আছে। তারা নিজেরাই গর্ব করে বলে দ্যাখো ভাই, রেখে ঢেকে বলতে পারি না। যা মনে আসে তাই-ই বলে দিই। কাউকে নিন্দেমন্দ করতে হলে ব্যাপারটা খুবই সহজ তা ঠিক। কিন্তু যখন কাউকে বলি, দ্যাখ, আমি কখনও মিথ্যা বলি না, তখন মনের 'সার্পোট'টা সব সময় পাওয়া যায় তো? ঠাকুর তা জানতেন বলেই এর সঙ্গে আরও একটা কথা যোগ করেছেন, 'তবে খুব রোক্ চাই।' এই 'রোক্'-টাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। স্বামীজীর ভাষায় আত্মবিশ্বাস। স্বামীজী কথাটাকে একটু বিস্তারিত করে বলেছেন, 'বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস, নিজের উপর বিশ্বাস-ইহাই আত্মোন্নতি লাভের একমাত্র উপায়।' আর এই 'রোক্' বা বিশ্বাস নিয়ে যদি কেউ কথাটা ধরে থাকে তবে মনের উপর যে অজ্ঞানের আচ্ছাদনটা থাকে তা ক্রমে ফিকে হয়ে যায়। তখন মনের আয়নায় নিজের আসল চেহারাটা স্পষ্ট হয়। তখন 'ছোট আমি'টা ক্রমশ 'বড় আমি'-তে বদলে যেতে শুরু করে। আমার ছেলে, আমার বাড়ি তখন হয়ে উঠে তাঁর ছেলে, তাঁর বাড়ি। ঠাকুরের কথায়—'আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান।' এই যে অনুভূতি—নিজেকে জানা—'আত্মানাং বিদ্ধি', তাকেই বেদান্তে বলা হয়েছে—আত্মানুভূতি। এই 'আত্মানুভূতি'-ই জীবনের লক্ষ্য।

যেদিন কলকাতায় স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবনটি সংস্কারের পর উদ্বোধন হলো, সেদিন খুব ভীড় হয়েছিল। স্বামীজীর মূর্তি যে কক্ষে (আসলে যা ছিল ছাদ—আঁতুড় ঘর) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে মঠের সন্ন্যাসীরাও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন তরুণ সন্ন্যাসী বোধকরি কাউকে এড়িয়ে সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তা দেখে পেছন থেকে অন্য একজন সন্ন্যাসীই বলে উঠলেন, 'তোর ভেদবুদ্ধি যে বড়!' কথাটা বুকে বড় বাজলো। এরকম ভেদবুদ্ধির আশ্রয় আমরা তো অহরহ নিচ্ছি। ব্যবহারিক জীবনে ভেদাভেদের রেখা তো টানতেই হয়। কিন্তু যে রাজ্যে প্রবেশের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি, সেখানে ভেদবুদ্ধির কোনও স্থান নেই। ঠাকুর নিজেই বলেছেন, লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। এই ভেদবুদ্ধির ঊর্ধে উঠলে কেমন হয়, তা নিয়ে ঠাকুর একটা ছোট্ট গল্প বলেছেন—"একজন সাধু সর্বদা জ্ঞানোন্মাদ অবস্থায় থাকতেন, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন না। লোকেরা তাঁকে পাগল বলে জানতো। একদিন সাধু লোকালয়ে এসে ভিক্ষে করে এনে একটা কুকুরের উপর বসে সেই ভিক্ষান্ন নিজে খেতে লাগলেন আর কুকুরটাকেও খাওয়াতে লাগলেন। তাই দেখে সেখানে অনেক লোক উপস্থিত হলো এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলে উপহাস করতে লাগল। এই দেখে সেই সাধু লোকেদেরকে বলতে লাগলেন—

বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষ্ণো
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।

লক্ষণীয় হলো, ঠাকুর এখানে যে পাগলটির কথা বলেছেন, যিনি লজ্জা ঘৃণা ভয়—এই তিন ভেদবুদ্ধিরই অতীত, তিনি জ্ঞানোন্মাদ। আমাদের মতো বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ নন। ঠাকুর সেকথা বুঝেই আর একটা গল্প বলেছেন—

'গুরু এক শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে বললেন, সকল জীবই নারায়ণ;শিষ্য তাই বুঝলেন। একদিন পথের মধ্যে একটা হাতি আসছিল, ওপর হতে মাহুত সকলকে সাবধান করে বলতে লাগল—সরে যাও, সরে যাও। শিষ্য ভাবলে, আমি সরে যাব কেন? গুরুদেব বলেছেন, সর্বজীবেই নারায়ণের অধিষ্ঠান। আমিও নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ, নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কী? সে সরল না। শেষে হাতি শুঁড়ে করে তাকে দূরে ফেলে দিলে, তাতে তার বড় ব্যথা লাগল। পরে সে গুরুর কাছে এসে সমস্ত ঘটনা জানালে গুরু বললেন, ভাল বলেছো, তুমিও নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ;কিন্তু ওপর থেকে মাহুত রূপে নারায়ণ তোমাকে সাবধান হতে বলেছিলেন, তুমি মাহুত নারায়ণের কথা শুনলে না কেন?"

গল্প এখানেই শেষ। এই ছোট্ট গল্পের মধ্য দিয়ে ঠাকুর শাস্ত্রের সার সত্যটাকে প্রকাশ করলেন, অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগভেদের দিকটাও কত সরলভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

ঠাকুর 'তাঁর মা'-কে সর্বস্ব দিয়েছিলেন, শুধু 'সত্য'-টাকে ছাড়া। কেননা, তিনি জানতেন, সত্যই ঈশ্বর। সত্যই নারায়ণ। আমরা তাই সত্যনারায়ণেরই পূজা করি। সত্যের প্রতি এই যে 'আঁট' বা নিষ্ঠা ঠাকুর সারা জীবনই তা ধরে রেখেছিলেন। একবার ঠাকুরকে অসময়ে বাহ্যে যেতে দেখে ভাগনে হৃদয় জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হলো মামা, পেট ব্যথা করছে? ঠাকুর বলেছিলেন, না, সকালে একবার বাহ্যে যাওয়ার কথা বলেছিলাম, তা সে সময় যাওয়া হয়নি, এখন তাই যাচ্ছি। মন মুখ এক করে 'সত্য'-র প্রতি এই আঁট বা নিষ্ঠাই হলো সাধনা। এগিয়ে চলার এমন প্রেরণার পাথেয় আর কোথায় পাওয়া যাবে? এরকম অসংখ্য ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট গল্প, ছোট ছোট আচরণের মধ্য দিয়ে ঠাকুর আমাদের পথ দেখিয়েছেন। আমাদের কৃপা করেছেন। তিনি কৃপাসিন্ধু। 'অবতার বরিষ্ঠায়' সেই কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণকে বারংবার প্রণাম।

বৃহস্পতিরায়মুকুট

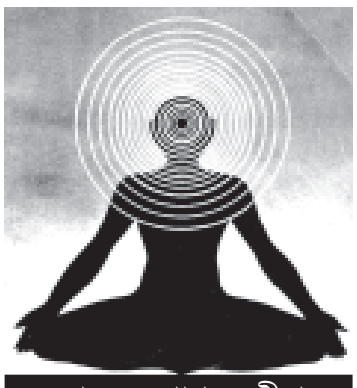

ভারতের শাশ্বত মনীষা

চিরন্তন চক্রবর্তী ঃ বৃহস্পতিরায়মুকুট ছিলেন রাঢ়দেশের অধিবাসী। তিনি মহিন্তাগাঁইয়ের রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বৃহস্পতির স্বকীয় উক্তিতে পাওয়া যায় যে তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ এবং মাতা নীলমুখায়ীদেবী। গোবিন্দ ছিলেন পরম বৈষ্ণব, ধার্মিক ও জ্ঞানী। প্রতিদিন তিনি ভাগীরথীতে স্নান করতেন। আবার নীলমুখায়ীদেবীও সর্বগুণান্বিতা ছিলেন। বৃহস্পতির সহধর্মিনীর নাম ছিল নিবৃতা।

কোন সময়ে বৃহস্পতি বঙ্গদেশে এসেছিলেন তা জানা না গেলেও সম্ভবত বৃহস্পতি এসেছিলেন রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দিন বঙ্গদেশের শাসক হিসেবে ক্ষমতা লাভের পূর্বে। গণেশের পুত্র জালালুদ্দিনের পূর্ব নাম ছিল জয়মল বা যদুসেন। তিনি মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে জালালুদ্দিন নামে সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে দেশে সংস্কৃত বিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। আর বঙ্গাধিপতি জালালুদ্দিনের রাজত্বকালে বৃহস্পতি পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর 'রায়মুকুট' উপাধি প্রমাণিত করে যে রায়মুকুট অর্থাৎ রাজা জালালুদ্দিনের মুকুট স্বরূপ ছিলেন এই বৃহস্পতি। পরবর্তীকালে জালালুদ্দিন বৃহস্পতিকে 'আচার্য' 'কবিচক্রবর্তী' 'পণ্ডিতসার্বভৌম' প্রভৃতি উপাধি দান করেন। একসময় বৃহস্পতি বঙ্গাধিপতির সেনাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বৃহস্পতির পুত্ররাও মন্ত্রিত্বের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ দেশ বিজয়ের পর খুব সম্ভবত বৃহস্পতিই প্রথম সংস্কৃতচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের গুণে নিবন্ধরচনাগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বৃহস্পতির গ্রন্থগুলি জনগণকে শিক্ষা দেবার জন্যই রচিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য আচার ব্যবহার যাতে সকলে সম্যক অবগত হতে পারেন এজন্যই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে প্রাচীন গ্রন্থ বহু থাকলেও জনসমাজে তা সম্যক বোধ করাবার জন্যই তার গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা।

পঞ্চ দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৃহস্পতি গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। কারণ আমরা দেখি তিনি তাঁর পদচন্দ্রিকায় উল্লেখ করেছেন যে তার এই গ্রন্থ ১৩৫৩ শকে অর্থাৎ ১৪৩১ সালে রচিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে কাব্য ও স্মৃতি দুই-ই পাওয়া যায়। যেমন—কুমারসম্ভব কাব্যের টীকা সুবোধা, রঘুবংশের টীকা রঘুবংশবিবেক। মেঘদূতের টীকা বোধবতী, শিশুপালবধের টীকা 'নির্ণয়বৃহস্পতি' এবং অমরকোষের টীকা 'পদচন্দ্রিকা'। স্মৃতিগ্রন্থের মধ্যে রায়মুকুট পদ্ধতি ও স্মৃতিরত্নহার। রায়মুকুট পদ্ধতির পুঁথি এখন পাওয়া যায় না। স্মৃতিরত্নহার গ্রন্থে তিনি হিন্দুদের আচার ব্যবহার ও তাদের অনুষ্ঠানের যথাযথ কাল নির্ধারণ করেছেন। বিশিষ্ট পুরাণ গবেষক ডঃ রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরার মতে রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস বৃহস্পতি রায়মুকুটের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। বস্তুত সেই সময় বৃহস্পতির পাণ্ডিত্য চারিদিকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

ছোট থেকে শিক্ষয়িত্রী হতে চেয়েছি, নৃত্যশিল্পী নয় : শিখা বাগ

ইন্দিরা রায়।। উনিশ শতকের চার/পাঁচ-এর দশকে চলচ্চিত্রে শিশু শিল্পী শিখা বাগের অভিনয় যাদের মনে আছে, তাদের মনের আসনে 'শিশুশিল্পী' একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। শুধু চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য নয়, শিশু নৃত্যশিল্পী হিসেবে ওই সময়ে যিনি ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন—তিনি এখন কেমন আছেন, কী করছেন এ ব্যাপারে তাঁর মুখোমুখি আলাপচারিতায় উঠে এল অনেক কথা।

ছোটবেলা থেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা তাঁর। মা গৌরী বাগ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বাবা বিমলেন্দু বাগ খুব ভাল অভিনয় করতে পারতেন, তবলা বাজাতেন। এই পরিবেশে মা ও বাবার প্রভাবে শিশু বয়সেই গান-নাচ-তবলা ও অভিনয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন শিখাদেবী। বাবার আগ্রহে অভিনয় জগতে বিশেষত চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সুযোগ আসে। অভিনয়ে দক্ষতা ছিল বাবার প্রেরণায়। ১৯৪৭-এ 'জাগ্রত ভারত' বইতে প্রথম অভিনয়। মাত্র ন' বছর বয়সে। কিন্তু ছবিটা মুক্তি পায়নি। ১৯৪৮-এ 'সংকল্প' ছবিতে মলিনাদেবীর ছোট মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই বয়সে এমন চরিত্র ভূয়সী প্রশংসিত হয়। পরিচালক বিভূতি লাহা ওনাকে ডেকে নেন এই চরিত্রের জন্য। এরপর

কিভাবে অভিনয় ও নৃত্য জগতে কাজ করেছেন, এ ব্যাপারে জানালেন শিল্পী নিজেই।

"'সংকল্প' প্রশংসিত হবার পর বম্বের পরিচালক সোহারাব মোদি আমাকে তাঁর 'ঝাঁসি কি রাণী'-তে ঝাঁসির ভূমিকায় অভিনয় করতে ডাকেন। ছ'শো মেয়ের মধ্যে নির্বাচন করেন আমাকে। ঝাঁসির অভিনয়ে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সেই বয়সে পৌরাণিক চরিত্র করতাম। নাচের ক্ষেত্রেও তাই। 'তুলসীদাস' বইতে বালক রামের চরিত্র আমাকে পরিচিতি দেয়। নৃত্যজগতে 'শিবতাণ্ডব' আমাকে অনেক পুরস্কার এনে দেয়। তখন বয়স মাত্র সাত-আট। আমার অভিনীত ছবি প্রচুর, সব তো উল্লেখ করা যায় না। তবুও যে সকল বই হিট করেছিল, তার কয়েকটা নাম বলছি—মা শেতলা, সংকল্প, মেজদিদি, তুলসীদাস, ইন্দ্রনাথ, বাণপ্রস্থ, মন্দির, নষ্টনীড়, রাণী রাসমণি, সাধক রামপ্রসাদ, অগ্নিপরীক্ষা, শিল্পী, বলয়গ্রাস, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রূপান্তর, সোনার কাঠি ইত্যাদি। তখনকার বড় বড় পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাঁরা হলেন—বিভূতি লাহা, কালীপ্রসাদ ঘোষ, নরেশ মিত্র, অর্ধেন্দু মুখার্জি, দেবকী বসু, সোহারব মোদি প্রমুখ।' প্রশ্ন করি, চলচ্চিত্র, আজ যাকে বড় পর্দা বলা হয়, সেখানে আর যুক্ত থাকলেন না কেন? উনি বললেন— 'অভিনয় করতে গিয়ে নাচটা ব্যাহত হচ্ছিল। কারণ নাচটা আমার প্রাণ। তবে অভিনয়কে ভালবাসি। গান আমার ভেতরে আছে। পাঁচ/ছ বছর আগেও গান নিয়ে চর্চা করেছি। তবলা সম্পর্কে খুবই ভাল অভিজ্ঞতা আছে। প্রথম প্রথম আমার স্কুলে আমিই বাজাতাম। কিন্তু একই সঙ্গে নাচ ও তবলা বজায় রাখা যায় না। তবে নাচ ও তবলায় বিশারদ হয়ে এখন পরীক্ষক হয়েছি।'

গান-নাচ-তবলা শিখতে তৎকালীন সময়ের স্বনামধন্য গুরুদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। মার কাছে গান শেখার পর পরেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন সুবিনয় রায়ের কাছে, সুনীল মুখোপাধ্যায়ের কাছে আধুনিক, মোহনলাল মিশ্রের কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত। নাচের প্রশিক্ষণ গোপাল ব্রজবাসী, মণিশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে, পরে কানন সেন। রবীন্দ্রনৃত্যে সুজিত সিংহের কাছে, বটু পালের কাছে লোকনৃত্য। নাচের ঘরানা হল ভরতনাট্যমের তাঞ্জোর ঘরানা। তবলার শিক্ষা প্রাথমিকস্তরে বাবার কাছে, পরে স্বনামধন্য লালচাঁদ বড়ালের ছোট ভাই কিষেণচাঁদ বড়ালের কাছে। উনিই তবলার প্রতি ভালবাসা তৈরি করিয়েছিলেন। এরপর সন্তোষ মল্লিকের কাছে।

শিশু বয়সে অভিনয় ও নৃত্যে শুধু প্রশংসিত হয়েছেন তাই নয়, প্রভূত সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের কথায় ঃ সাত আট বছরে যা সম্মান, পুরস্কার পেয়েছি তা সব বলা সম্ভব নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম হয়েছি, পদক পেয়েছি। 'ঝাঁসি কি রাণী'তে অভিনয়ের জন্য দিল্লি থেকে জওহরলাল নেহরু অ্যাওয়ার্ড পাই। তখন আমার বয়স দশ। একবার তখনকার 'রূপমঞ্চ' পত্রিকা উদয়শঙ্করকে সম্বর্ধনা জানায়। সেখানে একটাই নাচ ছিল তাঁকে দেখানোর জন্য। আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। আমার নাচ দেখে খুশি হয়ে উদয়শঙ্কর কোলে তুলে বলেন, তুমি

নাচটা করে যাও। এগুলোই বড় প্রাপ্তি। মানুষের কাছ থেকে সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া আমাকে আনন্দ দিয়েছে। এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি হতে পারে?

জিজ্ঞাসা করি, আপনি নাচ শিখে বড় হয়েছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত—নাচের ব্যাপারে আপনার বিশেষ কাজ কি? উত্তর আসে, 'নাচের ব্যাপারে আমার বিশেষ কাজ আমার স্কুল 'নৃত্যলোক'। ১৯৬২-তে বিয়ে হয়। শ্বশুরমশায়ের উৎসাহে চারটি মেয়েকে নিয়ে 'নৃত্যলোক' গড়ে তুলি ১৯৬৮-তে। এরপর শয়ে শয়ে ছাত্রী নাচ শিখছে। আমার নৃত্যলোকের মাধ্যমে আরও 'নৃত্যলোক' গড়ে উঠুক—এটাই বড় চাওয়া। কারণ, ছোট থেকে

শিক্ষয়িত্রী হতে চেয়েছি, নৃত্যশিল্পী হতে চাইনি। ছাত্রীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি বড় প্রাপ্তি। সপ্তাহের সাত দিনই নাচের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। বুধ, শুক্র, শনি, রবি বাড়িতে আর সোম মঙ্গল বৃহস্পতি বাইরে শেখাই। এই নিয়ে আমি আনন্দে আছি। ছাত্রীদের সঙ্গে মঞ্চে নাচও করি। পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে নৃত্যশিক্ষা সম্পর্কে আপনার পরামর্শ কি—'আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, ইচ্ছে থাকলে পড়াশোনার পাশাপাশি একটা কিছু শিক্ষা নিতে পার। ইচ্ছেটা থাকলে সবই সম্ভব। তাতে তোমাদেরই মঙ্গল হবে। যে সময়টা তোমরা তোমাদের রিক্রিয়েশন-এর জন্য ব্যয় করছ, সে সময়টা যদি নৃত্যশিক্ষায় মন দাও, অনেক বেশি আনন্দ পাবে। আর অনুশীলনের ব্যাপারে বলছি, ক্লাসে যেটা শিখছ, সেটা অভ্যাস করবে। পড়াশোনার মতোন এটাও তো শিক্ষা। অনুশীলন ছাড়া জীবনে সার্থক হওয়া যায় না। সেটা নাচই হতে হবে তা কেন? কোনও বিষয়কে নিয়ে চর্চা করলে তার গভীরে যেতে হবে। এছাড়া, জেনে রাখ, নাচ শরীরকে ঠিক রাখে। আলাদা করে জিমে যাবার দরকার নেই। সারা শরীরের ব্যায়াম হল নাচ। নৃত্য শিক্ষা স্বাস্থ্যের অনুকুল। এই ভেবে

।। চিত্রকথা ।। শ্রীলঙ্কার উৎপত্তি।। ৩

ভারতীয় কিষাণ সঙেঘর রাজ্য সম্মেলন

সম্মেলনের মঞ্চে কিষাণ সঙেঘর নেতৃবৃন্দ।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৯, ৩০, ৩১, জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের ঈশ্বরপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরে ভারতীয় কিষাণ সংঘের দশম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রভাকর রাও কেলকর ও কার্যকারিনী সমিতির সদস্য অজিত বারিক। সম্মেলনে প্রভাকর রাও আগত প্রতিনিধিদের সামনে কৃষক সমাজের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে তার প্রতিকারের জন্য কৃষকদেরই এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং সমাজের পরিবর্তনের কথা বলেন।

এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত, তিস্তা প্রকল্পকে দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। দ্বিতীয়ত, গো-পালন ও সংরক্ষণ এবং গো-চারণ মাঠের জন্য কৃষকদের স্বার্থে ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্মেলনে নির্বাচনের মাধ্যমে সুধাংশু পান সভাপতি ও নন্দলাল কাঠ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলা থেকে সম্মেলনে শতাধিক কৃষক ও মা-বোনেরা উপস্থিত হন। উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উত্তরবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত ও সভাপতিত্ব করেন নগেন্দ্রনাথ বর্মন।

৩১শে জানুয়ারি সকালে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা দাবী-দাওয়া নিয়ে স্লোগান ও শোভাযাত্রা সহ ঈশ্বরপুর শহর পরিক্রমা করেন। সম্মেলনের শেষে সমারোপ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অজিত কুমার বারিক।

হিন্দুস্থানকে ইসলামীস্তানে পরিণত করার ষড়যন্ত্র

(৯ পাতার পর)

মধ্য এশিয়া ও পাকিস্তানের নিষিদ্ধ পল্লীতে যেমন লাহোরের 'হীরা মাণ্ডী'তে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। নারী পাচারে সবদিকেই লাভ। বেশ্যাও বানানো যায় আবার পারিশ্রমিকহীন দাসী-বাঁদী কিংবা মজুরও বানানো যায়। 'লাভ জিহাদ' এইভাবে অন্তহীন নারী সরবরাহের এক সহজ পদ্ধতি নিশ্চিত করেছে। কেরলের সমুদ্রতটে এমনসব নৌকা তৈরি রাখা হয়, যেগুলিতে প্রমোদভ্রমণের নাম করে ওই মেয়েদের মাঝ সমুদ্রে অপেক্ষমান জাহাজে তুলে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। কেরলে বহু সংখ্যক ঘটনা ঘটলেও, 'লাভ জিহাদ' কিন্তু ভারতের অনেক রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাঙ্গালোরে বারগুলোতে এরকম ঘটনার শুরুতেই হিন্দু সংগঠনগুলো তা প্রতিরোধ করায় কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেছে। হিন্দু সমাজ জাগ্রত হলেই এই সমস্যা দূর হতে পারে। নচেৎ রিজওয়ানুরের মতো মুসলিম যুবক হিন্দু মেয়েকে নিয়ে পালাতে ব্যর্থ হওয়ায় তৃণমূল নেত্রী রিজওয়ানুরের মা-ভাইকে মাথায় করে ঘুরতে পারত না। কোনও মুসলিম মেয়ে হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করলে মুসলিম সমাজ তা সানন্দে গ্রহণ করে না কেন? তৃণমূল নেত্রীর কেন তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই? জম্মুর হিন্দু যুবক রজনীশ শর্মাকে স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী বিয়ে করেছিল কাশ্মীরের মুসলিম মেয়ে আমিনা। কাশ্মীরের পুলিশী হেফাজতে রজনীশের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর মানবিক আওয়াজ নেই কেন? হিন্দু নেতাদের এই মুসলিম তোষণই আজ গোটা হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছে। হিন্দু সমাজও নিদ্রিত। কারণ প্রেম সম্পর্কে তার আজন্মলালিত পবিত্র মানবিক মূল্যবোধ মানসিকতা এবং তৎউদ্ভুত জীবনশৈলী তাকে প্রেম সম্পর্কে নীচতায় আচ্ছন্ন করেনি। এখনই যদি কোনও হিন্দু সংগঠন দাবি তোলে মুসলমান যুবকদের সঙ্গে হিন্দু যুবতীদের প্রকাশ্য প্রেম অবৈধ ঘোষণা করতে হবে, তাহলে হিন্দু নেতা-নেত্রীদের তো বটেই এমনকি পত্র-পত্রিকাগুলোর হিন্দু আঁতেল লেখকরাও রে-রে করে উঠবে— এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। ইতিমধ্যেই কেরলের কমিউনিস্ট সরকারের ডিজিপি জেকব পুল্লোস কেরলের হাইকোর্টকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছেন, কেরলে লাভ জিহাদের মতো কোনও ক্রিয়াকলাপ চলছে না। জানা গেছে, এই লোকটি সি পি এমের একনিষ্ঠ কর্মী এবং সে এই পদে উন্নীত হয়েছে তার সিনিয়রকে টপকে। এছাড়াও কংগ্রেস এবং সি পি এমের বিভিন্ন গণসংগঠন সোচ্চারে কেরল হাইকোর্টের রিপোর্টের বিরোধিতা শুরু করেছে। বেকবু হিন্দু নেতৃত্বের এহেন বোকামি বিশ্বে বিরল। কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়ায় দুই তরুণী জিহাদিদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার আদালত ধর্ষকদের সামান্য শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়ায় সারা অস্ট্রেলিয়ার পত্র-পত্রিকা টিভিগুলো বিচারপতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট সঙ্গে সঙ্গে কঠোর আইন তৈরি করে জিহাদিদের কঠোর শাস্তি দিয়েছিল। উল্টোদিকে দেখুন, কলকাতা হাইকোর্টের একটি ঘটনা। মুর্শিদাবাদের ২৬ বছরের যুবক সাইরুল শেখ অনিতা রায় নামে হিন্দু নাবালিকাকে কিডন্যাপ করে বিয়ে করেছিল। মেয়েটির মা অপরহণ এবং নাবালিকা বিবাহের বিরুদ্ধে মামলা করে। সাইরুলের আইনজীবী দাবি করে যে, এই বিবাহ মুসলিম পার্সোনাল আইন অনুযায়ী বৈধ। কোর্ট তা মেনে নিয়ে সাইরুলকে জামিনে ছেড়ে দেয়। মুসলিম আইন হিন্দু নারীর ওপর কেন প্রযোজ্য হবে— এই প্রশ্ন আমাদের সাংসদেরা সংসদে তোলেনি। পত্র-পত্রিকাগুলিও আশ্চর্যভাবে নীরব।

বাইরে থেকে অনুপ্রবেশ এবং ভিতর থেকে 'লাভ জিহাদ'-এর মাধ্যমে মুসলিম জিহাদিদের একটিই উদ্দেশ্য— হিন্দুস্থানকে ইসলামীস্তানে পরিণত করা। ঠিক যেমনটি আশঙ্কা করেছেন নেদারল্যাণ্ডের সাংসদ গ্রেট উইল্ডার। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে বলেছেন, "ইসলাম সর্বদা চেষ্টা করেছে ইউরোপকে জয় করতে। স্পেন জয় করেছে অষ্টম শতাব্দীতে। ভিয়েনা ও পোল্যাণ্ড সন্ত্রস্ত। আজ একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম পুনরায় সক্রিয়। এবার আর সামরিক বাহিনী দিয়ে নয়, তারা জয় করতে চায় অনুপ্রবেশ আর জনসংখ্যা বাড়িয়ে।"

বাঁচার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সি পি এম

(৫ পাতার পর)

কথা হলো এই সাংগঠনিক ব্যবস্থায় সি পি এমের নিচের তলার কর্মীরা উৎসাহিত হবেন না। তবে নীচের তলার অধিকাংশ কর্মীই দীপক সরকার-সুশান্ত ঘোষের যুগলবন্দীর 'গণপ্রতিরোধ'-এর ব্যাপারে উৎসাহী। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী খালি বক্তৃতায় 'ওরা আমরা, দেখে নেব, মার খেয়ে ফিরবো না' প্রভৃতি কথা তো বায়ুপূর্ণ থলি বলে নিচের তলার কর্মীরা মনে করেন। আপাতত ব্রিগেডের সভার ব্যাপারে সবাই এক। তবে সদ্যসমাপ্ত সি পি এমের রাজ্য কমিটি এবং বর্ধিত রাজ্য কমিটির উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হলো — (১) গণপ্রতিরোধের জন্য স্কোয়াড তৈরি করা, কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্ব দীপক সরকারের। (২) পার্টির গোপন সংগঠনও গড়ে তোলা, যাদের অন্যতম কাজ হলো তৃণমূলের মধ্যে অনুপ্রবেশ এবং গোপন আস্তানা (ড্রেন) গড়ে তোলা, যাতে পার্টি নেতৃত্বের একাংশ আত্মগোপন করে কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

এই নিবন্ধের আগেই বলা হয়েছে, সি পি এম লিন পিয়াও-এর নীতি এবং কৌশল নিচ্ছে। এখানে উল্লেখ করতে হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার কৌশলের কথা পমেরয় লিখিত পার্টিজান ওয়ারফেয়ার-এ লেখা হয়েছিল। এর অংশবিশেষ একসময়ে (১৯৭১-৭২) সি পি এমের কলকাতা কমিটি বাংলায় অনুবাদ করে 'স্পেশাল স্কোয়াড'-এর হাতে তুলে দেয়। যিনি অনুবাদ করেছিলেন পার্টি তাঁকে 'অবাঞ্ছিত অনৈতিক' বলে বহিষ্কার করে দিয়েছিল।

এই কলামে বারংবার লেখা হয়েছিল, সি পি এমের শুদ্ধিকরণ উপরতলা থেকেই শুরু হওয়া দরকার। লিখেছিলাম— "মাছের মাথা থেকে পচন হয়।" লেখা হয়েছিল, 'শিরে হইল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা?'

সি পি এমের পলিটব্যুরো শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে প্রকাশ কারাতের বক্তব্য মেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত করেছে, শুদ্ধিকরণ পলিটব্যুরো কেন্দ্রীয় কমিটি এবং রাজ্য কমিটি থেকেই শুরু করা দরকার। আর নিচের তলায় নিষ্ক্রিয়দের সক্রিয়করণে ব্যর্থ হলে তাঁদের সমর্থক করে সভ্যপদ খারিজ করা দরকার।

উপর তলার নেতার জন্য সি পি এম সংবিধান সংশোধন করে 'ডিসিপ্লিনারি কমিটি' গঠন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পলিটব্যুরো। এব্যাপারে পলিটব্যুরোতে প্রধান উদ্যোগী ডঃ এম কে পান্ধে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলের সমস্যা মেটাতে পলিটব্যুরোর ব্যর্থতা তুলে ধরেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, পশ্চিমবঙ্গে পার্টির বিপর্যয় সম্পর্কে বহু প্রশ্ন তোলেন।

এই কলামে লেখা হয়েছিল, "সি পি এমের নিচের তলায় পার্টি কংগ্রেস অথবা প্লেনাম দাবি উঠেছে।" পলিটব্যুরোতে প্রকাশ কারাত সহ বেশ কিছু পলিটব্যুরো সদস্য পার্টি কংগ্রেস ২০১০-এর ডিসেম্বরে করার কথা বলেছেন। আপত্তি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। নিরুপমবাবু মোটামুটি নিমরাজি। বিমানবাবুদের যুক্তি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে পার্টি কংগ্রেস হলে ক্ষতি হবে। শেষপর্যন্ত বিমানবাবুদের দাবী মেনেই স্থির হয়েছে নির্বাচনের পরই পার্টি কংগ্রেস হবে।

পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম পরিচালিত যুব সংগঠনের অবস্থা করুণ। কাগজে বলা হয়েছে, দশ লক্ষ সভ্য কমেছে। আদতে সংগঠনে সত্যিকারের সদস্য সংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র। বহু পূর্বে এই কলামেই লেখা হয়েছিল, ভোটার লিস্ট দেখে যুব সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ঠিক হয়। এই অবস্থার কারণ যুব সংগঠনের মনিটারিং যাঁরা করেন, বিভিন্ন জেলাতে বিশেষ করে কলকাতায়, তাঁরা বক্তৃতাবাজি ও আড্ডাবাজিতেই সময় কাটান। আর যুব সংগঠনের তথাকথিত নিচের তলার কমরেডগণ অপসংস্কৃতি অথবা মহাগুরুকে সাবাশি দেন। উল্লেখ্য, কৃষকসভায়ও একই অবস্থা। নেতারা শহরে বসে কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। গাড়ি চেপে কৃষকসভার কাউন্সিল সভা করেন। কৃষকদের গরিষ্ঠ সংখ্যা সি পি এম বিরোধী। বিনয় কোঙার, সমর বাওড়া এবং মদন ঘোষ কি বলেন? সি পি এমের এই সমস্যা ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ-এর সমস্যা।

'লাভ-জেহাদ' কিছু সতর্কতা

(৯ পাতার পর)

মা-বাবা বিশেষত, মাকে লাভ জেহাদ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে ভয়াবহতার কথা বোঝাতে হবে। মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসকদের বর্বর অত্যাচারের বিষয়ে জানাতে হবে এবং একইসঙ্গে হিন্দুদের গৌরবময় ইতিহাস বিষয়েও অবহিত করাতে হবে।

ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের কুফল বিষয়ে বাড়ীর মেয়েদের জানাতে হবে।

মেয়েদের ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। লাভ জেহাদের ফাঁদে পড়ে প্রতারিত হয়ে যে মেয়েরা কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে তাদের পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য আন্তরিক হতে হবে।

সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্ব নিয়ে সমাজকে এই ভয়াবহ বিপদ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। সর্বোপরি ২৪ ঘন্টার হেল্পলাইন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বেতন দিয়েও দিয়ে কর্মী নিয়োগ করতে হবে। সব জেলাতেই এই হেল্পলাইন চালু করতে হবে।

প্রাথমিক ভাবে একটি হেল্পলাইন ইতিমধ্যে চালু হয়েছে— ০-৯৪৯৫৩-২৩৯০৫। এখানে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে কবি জন ডুনি একটি কবিতায় বলেছেন— "Ask not for whom the bell tolls, it tolls for thee." সাবধানতা আপনার জন্যও।

বাইচুং বিশ্ব একাদশে ভারত কবে বিশ্বকাপে ?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

একশো বছরের বেশি হয়ে গেল ভারতীয় ফুটবলের বয়স, অথচ এখনও পর্যন্ত বিশ্ব ফুটবলের মূলস্রোতে ঢুকতে পারল না। যদিও বার চারেক অলিম্পিক খেলা হয়েছে, কিন্তু বিশ্বকাপের মাঠ এখনও পর্যন্ত অধরা। অথচ এই ভারতেরই এক ফুটবলার ইতিমধ্যেই দু-দুবার বিশ্ব একাদশের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন। তাহলে কি বাইচুং ভুটিয়ার ব্যক্তিসত্ত্বা গোটা ভারতীয় ফুটবল সমাজের থেকে বৃহত্তর ? যে কোনও চিন্তাশীল মানুষের চোখে এই কৌতূহলটা নিশ্চয়ই হানা দেয়, কিন্তু উত্তরটা একপ্রকার রহস্যাবৃতই থেকে যায়।

১৯৪৮-এর লন্ডন অলিম্পিকের পর ভারতীয় দলের লেফট আউট রমন বিশ্ব একাদশ দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং অলিম্পিক সোনাজয়ী সুইডেনের বিরুদ্ধে বাছাই বিশ্ব একাদশে আধঘণ্টার জন্য মাঠেও ছিলেন। তার মৌলিক ডজ ও ড্রিবলিংয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং বৃটেন সম্রাজ্ঞী রাণী এলিজাবেথ। ফিফাও রমনের উইং-প্লের উৎকর্ষতাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। রমন ছাড়াও পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এমন বেশকিছু ফুটবলার উঠে এসেছিলেন যাঁরা নিঃসন্দেহে বিশ্বমানের। আমেদ খান, শৈলেন মান্না, পি কে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, বলরাম, ইউসুফ খান, জার্নেল সিং, অরুণ ঘোষ এরা প্রত্যেকেই বিশ্বকাপ খেলার যোগ্য ছিলেন। যেহেতু ভারত বিশ্বকাপ খেলেনি তাই তাদের এই সাধ ও স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেছে।

তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে সময়ের

তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকা ভারতীয় ফুটবলের পোস্টার বয় বাইচুং কোন কারণে বিশ্ব একাদশে সুযোগ পান ? বাইচুং-এর প্রায় সমসাময়িক বিজয়ন, আনচেরিরা তার থেকে খানিকটা হলেও গুণগত যোগ্যতায় এগিয়ে থাকা ফুটবলার, তারাও এশিয়ার একটা নির্দিষ্ট গন্ডীর বাইরে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। তবে একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো বাইচুং নিজের ফুটবল সত্ত্বাকে সফলভাবে প্যাকেজিং করেছেন। চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে লিগ ফুটবল খেলতে গেছেন। মাঠ ও মাঠের বাইরে ভারতীয় ফুটবলের 'আইকন' হিসেবে নিজেকে অহরহ বিজ্ঞাপিত করে তুলেছেন। আর তার নেতৃত্বে পরপর তিন বছর দিল্লির মাঠ থেকে এশিয়ান লেভেলে মোটামুটি সম্মানজনক তিনটি টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ানশিপ ছিনিয়েছে ভারত।

আসিয়ান কাপে ইষ্টবেঙ্গলের ঐতিহাসিক সাফল্যের পিছনেও বাইচুং-এর মস্ত ভূমিকা ছিল। তার আগে দীর্ঘ খরা কাটিয়ে ভিয়েতনামের মাটি থেকে এল জি কাপ জিতে আসে ভারত তারই নেতৃত্বে। এইসব ছোটোখাটো আন্তর্জাতিক সাফল্যও নিশ্চয়ই ফিফার কর্তাব্যক্তিদের প্রভাবিত করেছে। তাই ফিফা প্রেসিডেন্ট সেপ ব্লাটার কিংবা বিশ্ব তারকা জিনেদিন জিদান, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জানলেও বাইচুং-এর নাম শুনেছেন ও তার খেলার ভিডিও ফুটেজ দেখে মনোনীত করেছেন। আর বাইচুংও তার ওপর অর্পিত আস্থার প্রতিফলন দেখাতে পেরেছেন। ২০০৮-এ মিউনিখ ও ২০১০-এর লিসবন—দু- জায়গাতেই পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে গোল করেছেন ও বিশ্বতারকাদের সামনে নিজেকে মেলে ধরেছেন।

আর এখানে বেরিয়ে আসে বোধহীন শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস। বাইচুং পারলে ভারত কেন পারবে না ? আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ, খরাপীড়িত দেশ যদি বিশ্বকাপ খেলতে পারে তবে দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ ভারতকে কেন বিশ্বকাপ থেকে সহস্র আলোকবর্ষ দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ? দেশে প্রতিভার অভাব নেই, পরিকাঠামো ও সামাজিক ব্যবস্থাও আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। ফিফা ও একাধিক শিল্প-বাণিজ্য গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতাও আছে ভারতীয় ফুটবলে। তবে কেন বিশ্বকাপের ঢোকার ছাড়পত্র মিলছে না ? ১৫ বছর হয়ে গেল আধা পেশাদারী আঙ্গিকে জাতীয় লিগও চলছে রমরম করে কিন্তু দীর্ঘলালিত স্বপ্নের সাকার রূপ এখনও দেখা গেল না। স্বপ্নের ফেরিওয়ালা বাইচুং-এর 'শৈল্পিক টাচ'ও বিশ্ব ফুটবলের মূল স্রোতে ঢোকার বন্ধ দরজাটা খুলতে পারছে না।

খেলার জগৎ

দিল্লী-বিশ্বকাপেও হকির নবজাগরণ অসম্ভব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের ঠিক কি চোখে দেখে হকি ইন্ডিয়া ? নবগঠিত হকি ইন্ডিয়ার সঙ্গে জাতীয় খেলোয়াড়দের মাঝে-মধ্যেই সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে কেন ? ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকই বা কেন হাত গুটিয়ে বসে আছে। বিশেষ করে ক'দিন পরেই যখন বিশ্বকাপ হকি আর তা হচ্ছে দেশের রাজধানীতে। এসব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে ওই ছোট্ট একটা প্রবাদ বাক্যের মধ্যে। 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।'

আর এই আপ্ত প্রবাদটিই এখন এ দেশের ভারতীয় অনৈতিক ছন্নছাড়া কাণ্ডকারখানার প্রতীকি ব্যঞ্জনা। দেশের জাতীয় খেলা যে খেলা ভারতবর্ষকে এনে দিয়েছে অপার গৌরব ও মর্যাদার মণিকাঞ্চন, তার সঙ্গে এই বৈমাতৃ সুলভ আচরণ করেও হকি কর্তা ও সরকারী ক্রীড়ামন্ত্রক পার পেয়ে যাচ্ছেন। কারণ এই খেলাটির ব্যাপারে মিডিয়া উৎসাহী নয়। এক যুগ ধরে পূর্বতন হকি কর্তা কে পি এস গিল স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে গেছে। ভারতীয় হকিকে পাতালে নিক্ষেপ করে ছেড়েছেন। এখন তাকে সরিয়ে পুরো হকি ফেডারেশনের কাঠামো ভেঙে নতুন সংস্থা গঠন করার পরও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। আসলে শাসক পাল্টায় কিন্তু শাসন রীতি অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

খেলোয়াড়দের প্রাপ্য ইনসেনটিভ দিতে গড়িমসি করা হকি ইন্ডিয়ার কর্তারা ক্রিকেটারদের তুলনায় কিছুই পারিশ্রমিক দেন না হকি খেলোয়াড়দের। একটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পান খেলোয়াড়রা। আর জাতীয় শিবিরে থাকার সময় পান মাসিক দশ হাজার টাকা। সেই সামান্য টাকাটাই আটকে রেখেছেন হকি কর্তারা। পুণেতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের শিবিরেও খেলোয়াড়দের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে বহু টালবাহানা করেছিলেন কর্তারা।

বিশ্বকাপের গুরুত্ব অনুধাবন করে হকি কর্তারা কেন এই ব্যাপারটা নিয়ে এত টালবাহানা করলেন ? কিন্তু বিশ্বকাপের ঠিক আগেই এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা নিশ্চিত প্রভাব ফেলবে খেলোয়াড়দের মনে। বহুবছর পর দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ হচ্ছে। ১৯৮২-তে তৎকালীন মুম্বাই শহরে বসেছিল বিশ্বকাপ। ওই বিশ্বকাপ থেকেই পশ্চাদাপসরণ শুরু ভারতীয় হকির। তারপর থেকে মুম্বাই ব্যর্থতার বিরামহীন পথ পরিক্রমা। দিল্লীর বুকে হতে চলা আসন্ন বিশ্বকাপ হকিই হতে পারত ভারতীয় হকির পুনরুজ্জীবনের 'স্টেপিং স্টোন'। সে আশা সে স্বপ্নও ধূলিসাৎ হতে বসেছে। কোথায় নতুন উদ্যমে, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে মাঠে নেমে ট্রাডিশনাল হকি খেলে হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনবেন খেলোয়াড়রা, তার পরিবর্তে তাদের ভাঙা মন নিয়ে মাঠে নামতে হবে। দিল্লীর মাঠ থেকে হয়ত শূন্য হাতেই ফিরতে হবে ভারতীয় হকি দলকে।

শব্দরূপ - ৫৩৬

অপর্ণা ভদ্র

১	২			৩	■	■	৪
■		■	■		■	■	
■		■	■	৫	৬		
৭		৮	■	■		■	■
■	■		■	■	৯	১০	
১১			১২	■	■		■
	■	■		■	■		■
	■	■	১৩				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. পুরুষানুক্রমে পূজিত ও বাড়ির প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর, ৫. "কীর্তিস্তম্ভ সম্বলিত—সাম্রাজ্য আমার" শূন্যস্থানে আসমুদ্র, দুয়ে-চারে গূঢ়ার্থ, ৭. তৎসম শব্দে মুকুট, শিরোভূষণ, ৯. পদ্ম, ১১. মধুর অস্ফুট ধ্বনি, ১৩. মামার বাড়ি, দুয়ে-তিনে কার্পাস।

উপর-নীচ ঃ ২. অন্যনামে শিব ও দুর্গা, ৩. বিশেষণে তপস্যা করে এমন, মুনি ৪. উপাসনা-গৃহ, ৬. বিশেষণে অগ্নিহোত্রী, যজ্ঞাদি সর্বদা প্রজ্বলিত রাখে এমন, ৮. শক্তিবর্ধক ওষুধ, ১০. "সুন্দর বহে আনন্দ—" (রবীন্দ্র) পূরণীয় স্থানে মৃদু বাতাস, প্রথম দুয়ে হ্রাস, আগাগোড়া নোংরা, ১১. বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মুনিবিশেষ, প্রথম দুয়ে অতি সূক্ষ্ম অংশ, ১২. মুহূর্ত বা অতি অল্প সময়।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৩৪

■	■	প	র	শু	রা	ম	■
■	■	■	ত্না	■	■	ক	■
প্র	মা	■	ক	র্ণি	কা	র	■
■	কু	বে	র	■	রা	■	■
■	■	তা	■	জা	বা	লি	■
■	ব	ল	রা	ম	■	চু	ল
■	টু	■	■	রু	■	■	■
■	ক	ম	লা	ল	য়া	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া
বেড়াবেড়িয়া, বাগনান,
হাওড়া-৭১১৩০৩

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৩৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ১ মার্চ, ২০১০ সংখ্যায়

বইমেলা কি ঐতিহ্য হারাতে বসেছে?

নবকুমার ভট্টাচার্য

বইমেলা তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। না, মুখ্যমন্ত্রীর কথামতো কয়েকজন পরিবেশবাদীর জন্য এই ঐতিহ্য নষ্ট হয়নি। এই মেলার ঐতিহ্য নষ্ট হয়েছে একটি অপদার্থ, কর্মদক্ষতা বিলুপ্ত, ক্ষমতাহীন পরিচালকবর্গ সমন্বয়ে গঠিত সংস্থাকে কেন্দ্র করে, যারা বইমেলাকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের যে আবেগ, তাকে পুঁজি করে স্রেফ টাকা উপার্জনের খেলায় নেমেছে। আর আমাদের এই রাজ্যে যিনি সর্বঘটের কাঁঠালি কলা, যিনি তাঁর ঔদ্ধত্য আর বাগাড়ম্বরে বিশ্ব শাসন করার ইচ্ছে পোষণ করেন, তাঁর অপদার্থতাও বইমেলার এই ঐতিহ্য নষ্ট করা জন্য কম দায়ী নয়। তাঁর আশকারাতে 'পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড' নামক ৩৫ সদস্যের একটি সংস্থা 'আমরা' এবং 'ওরা'য় বিভক্ত হয়ে গেছে। এরপর বইমেলায় এবছর বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে দোষারোপের পালা চলছে। মিলনমেলা প্রাঙ্গণে বইমেলার উদ্বোধনে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরিবেশবিদদের 'বইমেলা বিরোধী কণ্ঠস্বর' হিসেবে ঘোষণা করলেও, তাঁর নিজের সরকার যে কতটা বইমেলা বিরোধী তা নিয়ে প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাধের কলকাতা বইমেলাকে নগরপাল নিষিদ্ধ ঘোষণা না করলেও, আগামী দিনে যে জনগণের কপালে অশেষ দুর্দশা অপেক্ষা করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভগবানের অশেষ কৃপা, মেলা অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় চূড়ান্ত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও কোনও অঘটন ঘটেনি। এই অপদার্থতার দায়ভার কেউ নিতে রাজি নয়। এই হচ্ছে রাজ্যের নিরাপত্তার নমুনা।

সরাসরি নাম না করলেও বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের অভিযোগের বান যে পরিবেশবিদের দিকে উঠেছে তিনি সুভাষ দত্ত। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জানিয়েছেন, এই কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী নিজের পদের অমর্যাদা করেছেন। কারণ, ময়দান থেকে সমস্ত মেলা সরিয়ে নেওয়া হবে, এই সিদ্ধান্ত তো রাজ্য সরকারের। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এই আদেশ দেয়। কোনও পরিবেশবিদ শুধুমাত্র বইমেলা বন্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লাগেনি। আসলে এটা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, যেটাকে মুখ্যমন্ত্রী পরিবেশবিদদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের সরকারকেই অসম্মান করছেন। কলকাতা বিশেষজ্ঞ চির দত্ত জানিয়েছেন, ময়দান বাঁচাতে এই আপত্তি। সব মেলা নিয়েই আপত্তি ছিল, সেই প্রক্রিয়াতেই সমস্ত মেলার সঙ্গে বাদ হয়ে গিয়েছে বইমেলাও।

গতবছর প্রথম বইমেলা হয় মিলনমেলা প্রাঙ্গণে। পরিকাঠামোর অভাবে প্রথম বছর নাকাল নাজেহাল হতে হয়েছিল বইপ্রেমীদের। কর্তারা বলেছিলেন, প্রথমবারের জন্য এই ত্রুটি, পরেরবার আর এমনটি হবে না। কিন্তু এক বছর সময় পেয়েও কর্তারা প্রথমবারের ত্রুটির সংশোধন করতে পারেনি। আর এজন্য এই প্রথমবার মেলার মাঠে গিল্ড অফিস ভাঙচুর হয়েছে। মেলার মানচিত্রের সঙ্গে স্টলের স্থানের মিল নেই। মিলনমেলায় বইপ্রেমীরা কিভাবে পৌঁছুবেন তার জন্যও কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই। বিকেলে যাওয়ার জন্য কিছু বাস থাকলেও রাত বাড়লে তাও উধাও হয়ে যায়। এই ছন্নছাড়া অবস্থা কেন? বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানালেন, এই সরকার অপদার্থ। এতদিন সময় পেয়েও একটা স্থায়ী বইমেলা প্রাঙ্গণ তৈরি করতে পারল না। আর পারবে কি করে! বইমেলা কার তাঁবে থাকবে সেই নিয়ে প্রথমে সুভাষ চক্রবর্তী আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লড়াই। এখন আবার নিরুপম সেনের সঙ্গে লড়াই চলছে।

লড়াই চলছে আর একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। সেটা 'আমরা' আর 'ওরা'র লড়াই। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করতে এলেও পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে বইমেলা ও গিল্ডের অন্দরেও। চেষ্টা হয়ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও হাজির করানোর। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে মমতা ছিলেন সমস্ত বইমেলা জুড়ে। তাঁর 'জাগো বাংলা'র স্টল জমজমাট ছিল সবসময়। মেলায় তাঁর বইও প্রকাশিত হয়েছে। গিল্ড অফিসে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়েছে সাদরে।

বইমেলার ঐতিহ্য হারানো প্রসঙ্গে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, অসুবিধা থাকলেও বইমেলা তার ঐতিহ্য হারায়নি। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের মধ্যে বইমেলা একটি। সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মতে, বইমেলাকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমাদের অবহেলায় এমন একটা সর্বাঙ্গসুন্দর মিলন মেলা ঐতিহ্য হারালে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। তবে বইমেলার ঐতিহ্য ও সম্মান যে নষ্ট হতে বসেছে সে প্রসঙ্গে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার সম্পাদক অশোক রায় জানালেন, আই-টি সেক্টর নিয়ে আদিখ্যেতার অন্ত নেই, অথচ বাংলা ভাষার ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকাশকরা বরাবরই অবহেলিত থেকে গেছে। কথাটা যে সত্যি, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় কান পাতলেই তা শোনা যাবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকাশকদের বক্তব্য, বইমেলায় ব্যবসা করে কয়েকটি বড় প্রকাশক ও দিল্লীর প্রকাশকরা। ভারতের বাইরের দেশগুলিও আসে ব্যবসা করতে। এ প্রসঙ্গে কবি জয় গোস্বামী জানালেন, বইমেলা উপলক্ষে ছোট-বড় প্রকাশকরা নানা বই প্রকাশ করেন এটাই আমাদের লাভ। বইমেলায় নানা সমস্যা থাকলেও বইপ্রেমী মানুষ কিন্তু হাজির হন মেলায়। বাংলা বইও বিক্রি হয়।

রাজ্য সরকারের অপদার্থতার জন্যই কলকাতা বইমেলা ঐতিহ্য হারাতে বসেছে, রাজ্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা নেই। সর্বত্র অধিকার কায়েম করার চেষ্টা— 'স্বস্তিকা'র প্রশ্নের উত্তরে একথাগুলি জানালেন বইমেলায় নিজের বই উদ্বোধনে আসা কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও জানালেন, এরাজ্যে মানুষের নিরাপত্তা নেই। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে কিছু ঘটে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। বইমেলা অন্ধকার হয়ে যাওয়ার নেপথ্যে রাজ্য সরকারের ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৌগত রায় জানালেন, বইমেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা আরও মজবুত হওয়া উচিত ছিল। আর এখানেই চোখে পড়ছে গিল্ডের অপদার্থতা। বইমেলা উপলক্ষে তাদের রোজগার তো কম হয় না। গতবছর তাদের লাভের ভাঁড়ারে যা ঢুকেছিল, বুদ্ধ বন্দনার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ২০ লক্ষ টাকার ভেট। ২৫ লক্ষ টাকা ভাড়া মুকুব করা হয়েছিল, মেলা যে এগারো দিন চলেছিল সেই ক'দিনের জন্য পুলিশী ব্যবস্থা করতে কোনও খরচ করতে হয়নি গিল্ডকে। মেলার ব্যবস্থাপনার অন্যতম অঙ্গ জল ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধার জন্য একটি কানাকড়িও খরচ করতে হয়নি তাদের। অথচ রোজগার হয়েছে টিকিট বিক্রির টাকা, স্টল বাবদ নামমাত্র পরিষেবার ব্যবস্থা করে দিয়ে প্রকাশক ও বিক্রেতাদের কাছ থেকে মোটা টাকা নেওয়ার ব্যবস্থা। পরিকল্পনার অভাবের জন্য বারবার ঘুরেফিরে আসছে বিমল ধর আর সবিতেন্দ্র নাথ রায়ের কথা।

বইমেলার গর্ব লিটল ম্যাগাজিন। গিল্ড কর্তারা এই লিটল্ ম্যাগাজিনকেই দিনদিন উপেক্ষা করে চলেছেন। এবারও লিট্ ম্যাগাজিনের পরিসর কমেছে। সেই স্থান দখল করেছে খাবারের স্টলগুলি। সব মিলিয়ে বইমেলা আকর্ষণ হারাচ্ছে।

নবদ্বীপ সংস্কৃত সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

গত ২৮শে জানুয়ারি শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ টায় নবদ্বীপ শ্রীশ্রী অনঙ্গ কুঞ্জে উদ্‌যাপিত হ'ল "নবদ্বীপ সংস্কৃত সমাজ"-এর ১৬শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সেইসঙ্গে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও প্রভুপাদদের উপস্থিতিতে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হল।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল অনঙ্গ মঞ্জুরী কুঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ বংশাবতংস মুরলীমোহন গোস্বামী মহাশয়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে 'নবদ্বীপ সংস্কৃত সমাজ'-কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য ও নিশীথকুমার স্মৃতিতীর্থ। বিশিষ্ট অতিথিরূপে মঞ্চে আসীন ছিলেন বৃন্দাবনধর গোস্বামী, বিষ্ণুপ্রসাদ গোস্বামী, শান্তিময় গোস্বামী ও নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা এবং কন্দর্প গোপাল গোস্বামী।

অধ্যাপক ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্যের মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। স্বাগত ভাষণ ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী। সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন অধ্যাপক ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য।

স্তোত্রবন্দনা সংস্কৃত গীত, ভজন প্রভৃতি নানা সংস্কৃত অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধ ছিল অনুষ্ঠানটি। মুরলীমোহন গোস্বামীর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর জীবনচরিত অবলম্বনে পণ্ডিতমণ্ডলীর রচিত স্মারকগ্রন্থ উন্মোচন করেন বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা।

সংস্কার ভারতীর

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

গত ২৬শে জানুয়ারি মঙ্গলবার, মালদা জেলা "সংস্কার ভারতী" আয়োজিত "ভারতমাতা পূজন্" এবং একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান, স্থানীয় টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদার বিশিষ্ট শিক্ষক ও ঐতিহাসিক ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ, এবং প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন মালদার বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ "ভারতমাতার" পূজা তথা মঙ্গল স্ত্রোত্র দিয়ে শুরু হয়। 'সংস্কার ভারতী'র মালদা জেলা সভাপতি দীনেন দে ভাষণ দেন। 'সংস্কার ভারতী'র সদস্যগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

এই অনুষ্ঠানটির একটি বিশেষ দিক হলো, মালদা সংস্কার ভারতীর সদস্যরা ছাড়াও শহরের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তা ছাড়াও অনেক নবীন শিল্পীদের এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এই মঞ্চ থেকে মালদা জেলা সংস্কার ভারতী ঘোষণা করে যে, আগামী অনুষ্ঠানগুলিতে শহরের বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেবে। বহুলোকের সমাগমে অনুষ্ঠানটি একটি নতুন মাত্রা পায়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে সংস্কার ভারতীর সদস্যর "বন্দেমাতরম্" গানটি গেয়ে অনুষ্ঠান সমাপন করেন।

Swastika
15 February - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

কর্মযোগী ভাঁওরলাল মল্লাবত ব্যাখ্যানমালা

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জড়ের মধ্যেও প্রাণের প্রমাণ দিয়েছেন : ডঃ যোশী

বক্তব্য রাখছেন ডঃ মুরলীমনোহর যোশী, (ডান দিক থেকে চতুর্থ)।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "যে কথা বিজ্ঞান অনেক পরে আবিষ্কার করে জেনেছে, তা আমাদের দেশের ঋষি-মুনিরা তাঁদের সাধনার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিলেন বহুযুগ আগেই। এজন্য তাঁদেরকে আপেক্ষিকতা, অনির্দেশ্যবাদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। ঋষিরা সাধনার দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। ধর্ম হলো সত্য সনাতন। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই রয়েছে। ধর্ম মানে কর্মকাণ্ড নয়, কোনও ব্যক্তি বিশেষের কথা বা শোনা বাণীমাত্র নয়। 'ধর্ম' অনেক ব্যাপক, সবাইকে ধারণ করে রাখে।" উপরের কথাগুলি বলেন বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ডঃ মুরলী মনোহর যোশী। গত ৮ ফেব্রুয়ারি বড়বাজার লাইব্রেরীর সভাকক্ষে 'কর্মযোগী ভাঁওরলাল মল্লাবত ব্যাখ্যানমালার'র বিষয় ছিল—'ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়।'

শ্রীযোশী আরও বলেন, আমাদের দেশের ঋষিরা বলেছেন—'সর্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি'। বিজ্ঞান অনেক পরে সবকিছুর মধ্যে এক শক্তির অবস্থান আবিষ্কার করেছে। আইনস্টাইন বলেছেন—'$E=MC^2$'। ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু গাছেরও যে প্রাণ, মমতা, মানুষের মতো উপলব্ধি রয়েছে তা প্রমাণ করে বিশ্বকে দেখিয়েছিলেন। কাণ্ডের মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাঁর পুরস্কার পাওয়া উচিৎ ছিল বলে ডঃ যোশী আক্ষেপ করেন। দেশ পরাধীন ছিল বলে তিনি স্বীকৃতি পাননি। বিজ্ঞান ইলেকট্রন, প্রোটনে বস্তুকণাকে ভেঙেছে। এক থেকে অনেক। উপনিষদ বলছে—একোঽহম্ বহুস্যাম্। ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি কণা পরস্পর সংযুক্ত। ডঃ বসুর অন্যতম আবিষ্কার হলো ইলেকট্রনিক ওয়েভ। ঋষিরা অনুভবের মাধ্যমে সাধনার দ্বারা একাত্ম হতেন। যে কারণে গোরুকে আঘাত করলে তা স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবের শরীরে দেখা যেত।

শ্রীযোশী বলেন, সৃষ্টি হলো শরীর, ধর্ম হলো তার আত্মা। ধর্ম না থাকলে সৃষ্টিও থাকবে না।

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ হলো খণ্ডিত দৃষ্টি। বিজ্ঞান জীবন তৈরি করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা খুঁজছেন চেতনা বা জীবন কোথা থেকে এল। ব্রহ্মাণ্ডের একটি কণা অন্য কণার সঙ্গে সংযুক্ত। সৃষ্টির মধ্যে বিবিধতা আছে। বৈচিত্র্যের আনন্দকে গ্রহণ করতে হবে। ভেদবুদ্ধি করলে চলবে না। একত্ব ও একাত্মতার অনুভব করতে হবে। সন্ত কবীর হাতী ও পিঁপড়ের মধ্যে একই পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। এদেশের দৃষ্টি হ'লো একাত্ম দৃষ্টি-হোলিস্টিক।

একত্বের অনুসন্ধান বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েই করে চলেছে। এটা চলতে থাকুক।

এদিন অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ তাঁর ভাষণে যোশীজীর বক্তব্যকেই আরও ব্যাখ্যা করেন।

এদিন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিমল লাটের লেখা 'সাকার হোতা স্বপ্না' নাটকের আবরণ উন্মোচন করেন ডঃ মুরলী মনোহর যোশী। সভার শেষে ধন্যবাদ জানান প্রবীণ সমাজসেবী যুগলকিশোর জৈথেলিয়া, সভা পরিচালনা করেন অশোক গুপ্তা। স্বাগত ভাষণ দেন জয়গোপাল গুপ্তা। বিশিষ্ট অতিথিরা অনুষ্ঠান শুরুর সূচনায় ভাঁওরলালজীর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। মহাবীর বাজাজ, ঘনশ্যামদাস বেরিওয়াল, অরুণ মল্লাবতসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতায় স্মরণসভায় শ্রদ্ধার্ঘ্য

মনোমোহন রায় আপোষহীন সমাজসেবী

কেশব ভবনে স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করছেন জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। শুধু সঙ্ঘের কার্যকর্তা হিসাবে নয়, একজন 'ডায়নামিক' সমাজসেবী হিসাবেও মনোমোহন রায় সুপরিচিত ছিলেন। অন্যায়ের সঙ্গে কোনও রকম আপোষ করতেন না। অত্যন্ত জেদী। প্রখরতেজা। একাই একশো। তাঁর কর্মজীবনের ব্যাপ্তি ও কর্মধারা ছিল বহুমুখী। মৃত্যুর আগের দিনও তিনি লোকসম্পর্ক করে গিয়েছেন। আজন্মব্রতী এক সন্তস্বরূপ সঙ্ঘের প্রচারক। এভাবেই গত ৬ ফেব্রুয়ারির বিকালে কলকাতায় কেশব ভবনে প্রয়াত মনোমোহন রায়ের স্মৃতিচারণ করে বক্তারা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

গীতাপাঠের মধ্য দিয়ে এই স্মরণসভার সূচনা। এরপর প্রয়াত মনোমোহন রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান আর এস এসের পূর্ব ক্ষেত্রের বর্তমান সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। একে একে শ্রদ্ধা জানান অমল কুমার বসু, বসন্তরাও ভট্ট, রমাপদ পাল, প্রদীপ দে, সুশীল রায় এবং স্বস্তিকা, বি এম এস, কিষাণ সঙ্ঘ ও বিজেপি'র প্রতিনিধিরা।

এরপর প্রয়াত মনোমোহন রায়ের জীবনের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করে স্মৃতিচারণ করেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় আঢ্য, প্রদীপ ঘোষ, বিভা রায় (ভাইঝি), বিশ্বরূপ চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী প্রমুখ। পরে উপস্থিত সকলেই পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর এক মিনিট নীরবতা পালন ও শান্তিমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে স্মরণসভা শেষ হয়।

প্রকাশিত হবে ২২ ফেব্রুয়ারি '১০ স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে ২২ ফেব্রুয়ারি '১০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে তার সঙ্কেত। ধ্যানমগ্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃতির এই স্বর্গীয় ঐশ্বর্য। আয়োজন করেছিলেন শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের। শুধু তাই নয়, এই বসন্ত পূর্ণিমায়, দোলখেলার শুভ লগ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। এই দুই বিষয়ই আগামীবারের আকর্ষণ।

।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।। সত্বর কপি বুক করুন

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com